ছ জনে মিলে

আশাপূর্ণা দেবী



প্রকাশন বিভাগ

দু জনে মিলে

আশাপূর্ণা দেবী

ছবি
পুলক বিশ্বাস

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

জুলাই, ১৯৭৯ (July, 1979)

শ্রাবণ, ১৯০১ (Sravana, 1901)

CHHA JANE MILE

(Collection of original short stories in
Bengali written by Smt. Ashapurna Devi
for children)

মূল্য : নয় টাকা

Price : Rs. 9·00

ডিরেক্টর, প্রকাশন বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার,
পাতিয়ালা হাউস, নূতন দিল্লী-১১০০০১ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশন বিভাগের কয়েকটি বিক্রয়-কেন্দ্র :

৮, এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলিকাতা-৭০০০৬৯
সুপার বাজার, কনট সার্কাস, নূতন দিল্লী-১১০০০১
বিহার স্টেট কো-অপারেটিভ বিল্ডিং, অশোক রাজপথ, পাটনা
কমার্স হাউস, করিমভয় রোড, ব্যালার্ড পায়ার, বোম্বাই-৪০০০৩৮
শাস্ত্রী ভবন, ৩৫, হ্যাডোস্ রোড, মাদ্রাজ-৬০০০০৬

নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ কর্তৃক মুদ্রিত

কি কি গল্প এতে আছে

সৃষ্টিধর্মী বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবী এক-ডাকে-চেনা নাম। ছোটদের লেখা দিয়েই তাঁর সাহিত্য জীবনের সুরু এবং খ্যাতির সূত্রপাত। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্প্রতি তাঁকে জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে বিভূষিত করা হয়েছে। ছোটদের এই গল্প সঞ্চয়নটি আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশন বিভাগের জন্য আশাপূর্ণা দেবী বিশেষভাবে রচনা করেছেন।

তুলতুলের ভবিষ্যতের ভয়

স্কুল থেকে ফিরে আজ খাবারও খায়নি তুলতুল, পার্কে খেলতেও যায়নি। মুখ ভার আর চোখ লাল করে চুপ করে বসে আছে ছাতের সিঁড়ির দরজার কাছে। এখানে এ সময় কেউ আসে না, তাই রাগে দুঃখে অপমানে ছুটে চলে এসেছে তুলতুল এইখানেই।

অপমানটাই বেশী। এর চাইতে যদি কেউ তুলতুলকে দু'ঘা মার লাগিয়ে দিতো, তাও ভাল ছিল। কি আর হতো তাতে? গায়ে একটু লাগতো, মনে তো আর লাগতো না এমন? দাদা তো যখন তখনই অমন মারে। মা বলে ওঠে, "আহা কেন বেচারীকে অমন পেটাচ্ছিস খোকা?"

আবার মা-ও যে কখনো কোনো সময় ও কাজটি করেনা তা নয়। কথা-টথা একটু না শুনলে দেয় একখানা চড় বসিয়ে, কিন্তু সে দুঃখুও তো তক্ষুনি নিবারণ হয়ে যায়। তুলতুলের একটু কান্না কানে গেলেই ঠাকুমা কোথা থেকে না কোথা থেকে ছুটে এসে হৈ-হৈ করে পড়েন, "আহা হা বৌমা গো মারলে মেয়েটাকে? কেন বাপু কী এমন দোষ করেছিল? মরে যাই! কচি গালটি লাল হয়ে উঠল!"

লাল না হলেও বলেন।

তখন তুলতুলকে পায় কে!

কিন্তু আজ? আজ কিনা স্কুল থেকে এসে বইয়ের ব্যাগটা নামাতে না নামাতে ঠাকুমাই বলে উঠলেন, "এই যে বাহাদুর মেয়ে এলেন! এখন দ্যাখো বাহাদুরীর ফল। তা তোমার আর কী? ভুগতে আমরাই ভুগবো।"

সঙ্গে সঙ্গে মা অমনি বলে উঠলো, "আমরা কেন ভুগতে যাবো? যার বাহাদুরীর ফল, সেই ভুগুক। তুলতুলই বাসন মাজুক, ঘর সাফ করুক, মশলা বাটুক। ওর জন্যেই যখন টুনির মা পলায়ন দিয়েছে!"

দাদাটাও কিনা তাতে সায় দিয়ে বলল, "মা ঠিক বলেছে। তাই উচিত ওর। ওর জ্বালাতনেই তো টুনির মা—"

হ্যাঁ, সব্বাই এই দোষ দিচ্ছে তুলতুলকে, তার জ্বালায় পড়ে টুনির মা চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

মা অবিশ্যি টেবিলে খাবার গোছাতে গোছাতেই বলছিল, "খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর করে কাজে লেগে পড়ো তুলতুল, কথা যখন শোনোনি কারুর।"

কিন্তু সেই খাবার খাবে তুলতুল?

তুলতুল স্কুলের পোষাক পর্যন্ত না ছেড়ে তীরবেগে ছাদের সিঁড়িতে উঠে এসে বসে আছে। প্রথমে একটু কেঁদেও ফেলেছিল, এই সময়ই তো যত রাজ্যের খিদে পায়, অথচ এখনই ওকে চলে আসতে হল টেবিলে সাজানো প্লেটের দিকে না তাকিয়ে। এখন আর কাঁদছে না তুলতুল, এখন শুধু বসে বসে ভাবছে, 'জ্বালাতন'টা কী করেছিল সে টুনির মাকে? শুধুতো কাল স্কুল থেকে ফিরে বলেছিল, "টুনির মা, এই শীতে টুনিকে শুধু একটা ছেঁড়া ফ্রক পরিয়ে নিয়ে এসেছ? আবার ওকে দিয়ে চায়ের বাসনও ধোয়াচ্ছো?"

টুনির মা বলেছিল, "পেত্যহই তো ধোয়! তাড়াহুড়োর সময়।"

"পেত্যহ আবার কী? প্রত্যহ বলতে পারো না?" তুলতুল বলেছিল, "বেশ বলছ তো? কী রকম মা তুমি? জানো এটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ?"

আর তখন টুনির মা'র বোকার মত তাকানো দেখে বলেছিল, "ওঃ তুমি তো আবার এ কথার মানেই বুঝবে না। শোনো, আমাদের মিস বলেছেন—"

টুনির মা হাতের কাজ থামিয়ে বলল, "কে বলেছেন?"

"আরে বাবা আমাদের স্কুলের মিস, মানে আঃ ইয়ে মাস্টার, মাস্টার-দিদিমণি বুঝলে ? বলেছেন, এই যে নতুন বছরটা পড়েছে, এটা হচ্ছে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে ! এই বছরে—"

টুনির মা আবার ঘস্-ঘস্ করে কড়া মাজতে মাজতে বলল, "মেয়ের কথা শোনো ! বছরটা কি খ্যাল্না পুঁতুল না রসগোল্লা, যে ছোট ছেলেপেলের জন্যে ? বছর হচ্ছে পঞ্জিকার।"

আচ্ছা, এমন বোকার মত কথা শুনে কার না রাগ হয় ? তবু তো তুলতুল ওকে বকেও নি, চুলও টেনে দেয়নি, এমন কি গায়ে একটু জল ছিটিয়ে পর্যন্ত দেয়নি। শুধু জোর গলায় বলেছে, "তুমি একেবারে বোকা বুদ্ধু। বলছি মিস বলেছেন, এই বছর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদেরকে বেশী বেশী যত্ন আদর করতে হবে, ভালো ভালো খাবার খেতে দিতে হবে, ভালো জামা-জুতো পরাতে হবে, লেখাপড়া শেখাতে হবে, যাতে অসুখ-বিসুখ না করে তা দেখতে হবে, বাজে বিচ্ছিরি কাজটাজ করানো চলবে না, বুঝলে ?"

টুনির মা একটু হেসে বলল, "বুঝলাম।"

বলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "হাঁ করে কথা গিল্‌তে হবে না, হাত চালা !"

তবে ? তুলতুল রেগে বলবে না······"ছাই বুঝলে ! হাতি বুঝলে ! টুনি খবরদার আর জল ঘাঁটবি না। এই শীতে ওই ঠাণ্ডা জলে হাত দিয়ে দিয়ে চায়ের বাসন ধোয়া হচ্ছে ! ভারী গিন্নী হয়েছিস ! রেখে দে বলছি ! ······মা, টুনিকে একটা গরম জামা দাও তো শীগ্‌গির ! হি হি করছে !"

মা তখন কিনা চোখ আকাশে তুলে হেসে হেসে বলল, "গরম জামা ? ওঃ আচ্ছা—গরম জামা, আয় গরম জামা আয় ! টুপ্ করে আকাশ থেকে পড় ! টুনির গায়ের মাপে !"

তার মানে ঠাট্টা।

তুলতুলের যেন একটা মান্য নেই।

তুলতুল কড়া গলায় বলল, "আমার ছোট হয়ে যাওয়া ফ্রক সোয়েটার



...হাঁ করে কথা গিল্‌তে হবে না, হাত চালা!

কার্ডিগান কিচ্ছু নেই বুঝি? সেগুলো টুনির গায়ে হয়না বুঝি?"

"ঢের দেওয়া হয়েছে বাবা, পরায় না তো কী করব?"

"পরায় না?" তুলতুল অবাক!

"টুনির মা! পরাও না কেন শুনি?"

টুনির মা রাগ-রাগ গলায় বলল, "পরিয়েছিনু তো—ও বছর। তা ময়লা হতে সেদ্ধ করে কাচতে গে' সব গলে গলে পড়ে গেল।"

তুলতুলের মা বলল, "পশমের জিনিস সেদ্ধ করলে? চমৎকার তুলতুল আয় চলে আয়, খাবি আয়। আর বক্‌বক্ করতে হবে না।"

কিন্তু তুলতুল তা শুনবে কেন?

মিস বলেছিলেন না—"আমাদের সব বাড়িতে বাড়িতে যে-সব লোক কাজ করে, মানে, বাসন মাজে, কাপড় কাচে, ঘর সাফ্ করে—শুধু তাদের বাচ্চাদেরও যদি আমরা একটু ভালবাসার চোখে দেখি, যদি চেষ্টা করি তারা যাতে একটু ভাল খেতে পায়, শীতে জামা পরতে পায়, লেখাপড়া শিখতে পায়, অসুখবিসুখে ওষুধ পায়, তাহলেও পৃথিবীর কিছু কাজ করা হয়। যদিও তোমরা এখন ছোট, তবু এখন থেকেই ভাবতে শিখবে—যাতে পৃথিবীর কিছু কাজে লাগতে পারো। জেনো সব মানুষই সমান, সব ছোট বাচ্চারই যত্ন পাবার অধিকার আছে।"

'মিস'-এর সেই কথা মত তুলতুল কাজ করার চেষ্টা করবে না?

তুলতুলের থেকেও ছোট্ট টুনি, রোগা হাড্ডি—সে এই শীতে জল ঘেঁটে ঘেঁটে কাজ করবে আর তুলতুল গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে, গরম জামাটামা পরে মনের আনন্দে ফুলো ফুলো গরম লুচি খেতে বসবে?

রোজই এই রকম হয় সত্যি, তুলতুল দেখেও, কিন্তু জানতো না তো এগুলো কত দোষ! বড়রাও তো তেমনি! তুলতুলের বেলায় গরম লুচি, আর টুনির বেলায় শুকনো শুকনো রুটি। বললে আবার ঠাকুমা বলেন, "তুই থাম তো! অত পাকামি করতে হবে না।"

কিন্তু আর বড়দের ওইটি করতে দেবে না তুলতুল। আজ তো বুঝে

ফেলেছে, এ-রকম করা খুব খারাপ। এই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে, বেচারী টুনিদের মত শিশুদেরই যত্ন করতে হয়। ওদের মা'রা তো লোকের বাড়ি কাজ করতে আসে, কখন বাড়ি গিয়ে লুচি করে দেবে ছেলেমেয়েদের ?

অথচ তুলতুলদের ?

বামুন ঠাকুরই তো সব করছে।

আর একটু বেশী বেশী ময়দা মাখতে পারে না ?

তুলতুল তাই চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "যাচ্ছি, তুমি দাও না!···এই টুনি, আমার সঙ্গে চলে আয়, লুচি খাবি।"

শুনে মা ওখান থেকে বলে উঠল, "আঃ তুলতুল কেন দেরী করছিস ? ওকে লুচি দেব অখন, তুই আগে খা' তো!"

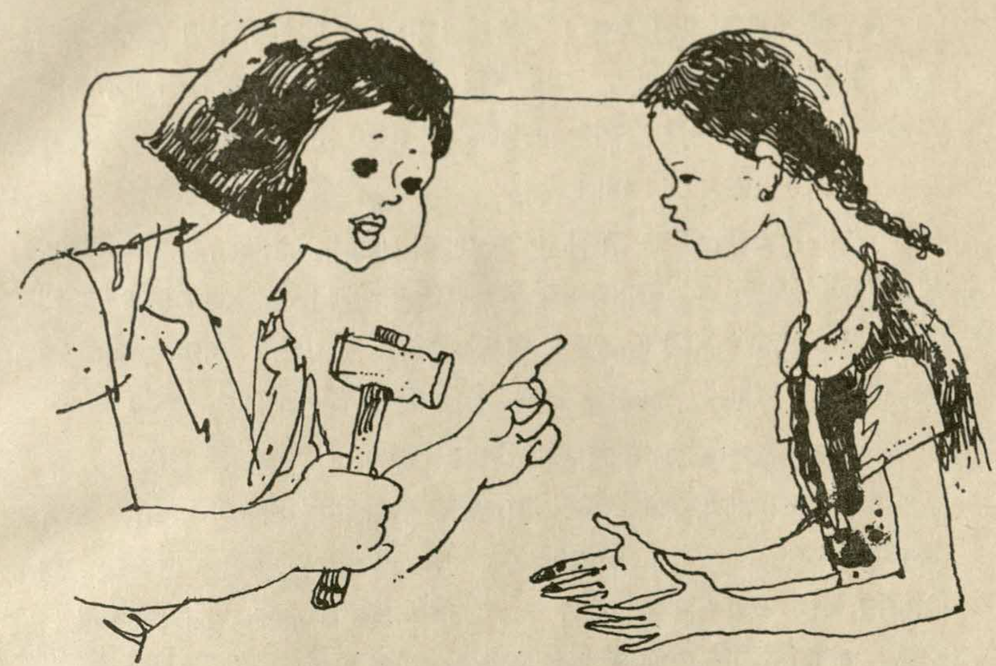
"কেন ? আমি আগে খাব কেন ?"

"বাঃ! তুই স্কুল থেকে এলি না ? আচ্ছা, ওকেও দিচ্ছি বাবা, তুই বোস তো!"

টুনির মা-ও বলল, "যাও খুকু। দেরী করলে মা বকবে। আজ বুজি খিদে নাগেনি ? ···টুনি, তুই ত্যাতোক্ষণ কয়লা কটা ভেঙে ফ্যাল তো!··· সকালের আঁচটা সাজিয়ে রেখে যাই।"

আচ্ছা, এর পরও তুলতুল টুনির মা'র গায়ে একটু জল ছিটিয়ে দেবে না ? একটুখানিই তো দিয়েছিল!···কত সময়েই তো দেয়। কোনোদিন রাগ করে ? হাসেই তো!

তারপর অবশ্য তুলতুল টুনির হাত থেকে কয়লাভাঙা হাতুড়িটা কেড়ে নিয়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, "কক্ষনো মার কথা শুনবি না টুনি। এটা হচ্ছে—শিশুবর্ষ, বুঝলি ? শিশুবর্ষ থেকে ছোট বাচ্চাদের এইসব বিচ্ছিরি কাজ বারণ!···আর তুই সকাল বেলা ডিপো থেকে দুধ আনতে যাবি না, মায়ের সঙ্গে পচা পচা গোবর কুড়োতে যাবি না, বুঝতে পারছিস ? ঢুকছে মাথায় ?"



হাতুড়িটা দে' দ্যাও দিদি, মা বকবে

এর উত্তরে বোকা টুনিটা ভয়ে ভয়ে বলল কিনা, "হাতুড়িটা দে' দ্যাও দিদি, মা বকবে।"

"ইস! বকলেই হল। মিসকে বলে দিলে বুঝবে মজা!...তবু দাঁড়িয়ে রইলি? আয় বলছি।"

বলে টুনিকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে খাবার ঘরে নিয়ে এসেছিল মাত্র, লাগেওনি কিছুই না, তবু বোকাটা কেঁদেই ফেলল। আসলে বকুনি খাবার ভয়ে—তুলতুল কি সেটা বুঝে ফেলেনি?

তা' মা তখন তাড়াতাড়ি সন্দেশের একটা খালি বাক্সর মধ্যে চার পাঁচটা লুচি, একটু আলুভাজা আর একটু গুড় নিয়ে টুনির হাতে দিয়ে বলল, "যা টুনি মায়ের কাছে গিয়ে খেগে যা।"

টুনিটা পালিয়ে বাঁচলো।

তুলতুলের তো ইচ্ছে ছিল না কিন্তু নিজেরও তখন খুব খিদে পেয়ে

গেছে, তাই খেতে বসে গেল। তবে মা যখন তুলতুলকে ডিম ভেজে দিল আর মাছের তরকারি দিল, তখন মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, কাল থেকে মা যদি টুনিকেও ওইসব না দেয়, তুলতুলও খাবে না।

বললও মাকে সে কথা।

"আমি তো এতো মোটা, তবু এতো এতো খেতে দিচ্ছো আমায়, আর টুনিটা ঠিক চড়াই পাখির মতন, ওকে কিছু দাও না। জানো এটা শিশুবর্ষ?"

মা বলল, "জানি। মেলা বক্‌বক্ করিস না তো! মাথায় এই এক ভূত চাপল মেয়ের!"

কিন্তু ভূত চেপে বসলে তো উপায় নেই।

তুলতুল খেয়ে উঠে দেখল টুনি আর টুনির মা বাড়ি যাচ্ছে। তখন বকাটকা কিছু নয়, ভাল কথাতেই বলেছিল, "কাল থেকে আর এই সব বিচ্ছিরি কাজ করবি না। কাল বাপী তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে।"

এটা কি টুনির মাকে 'জ্বালাতন' করা হল?

বাবাকে গিয়ে ধরে পড়াতে, বাবা বলল, "তা সত্যি, দিলেও হয়! আজকাল তো আর স্কুলে মাইনে লাগছে না, বইটই ফ্রী, তা ছাড়া টিফিনও দেবে অমনি।"

"সত্যি বাপী?"

"হ্যাঁ রে খুকু! এই সব নিয়ম হয়েছে।"

"টুনিও তাহলে অঙ্ক কষতে পারবে বাপী?"

"কেন পারবে না? শিখলেই পারবে। মানে শেখালেই পারবে।"

"বই পড়তে পারবে?"

"নিশ্চয় পারবে। মেয়েটা বোকা নয়।"

তুলতুল গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিল, "টুনির মা কিন্তু খুব বোকা বাপী। ওইটুকু মেয়েকে দিয়ে বাসন মাজায়, কয়লা ভাঙায়, ঘর মোছায়। অথচ ইস্কুলে দিলে টুনি ঠিক আমাদেরই মত হতো। বোকা নয় বাপী?"

"তা বটে। কী করবে বল? নিজে তো লেখাপড়া শিখতে পায়নি, বুদ্ধি হবে কী করে?"

"বুড়ো ধাড়িরাও পড়তে লিখতে শিখবে এমন ইস্কুলও তো আছে বাপী? আছে না?"

"আছে বৈ কি খুকু!"

"টুনির মাকেও তাহলে ভর্তি করে দিও না? একটু বুদ্ধি হবে।"

বাবা হেসে বলেছিল, "তাই ভালো। কাল সকাল বেলাই যে-ই ওরা আসবে, মা মেয়ে দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়ে ইস্কুলে বসিয়ে দিয়ে আসবো।"

তুলতুল আহ্লাদের চোটে প্রায় নেচেই ফেলে।

সত্যি, বাপী কী ভালো! বাড়ির সব্বাইয়ের থেকে ভালো।……তবে একটা দোষ, সব কথা ঠাকুমাকে বলা চাই। তক্ষুনি হেসে হেসে হাঁক দিলো, "ওমা শুনছো—তোমার নাতনীর অর্ডার—"

বলা তো নয়, সঙ্গে সঙ্গেই তো ঠাকুমার গলা শোনা গেল, "বেশী সর্দারী করতে যাসনে তুলতুলি। যা রয় সয় তাই ভালো। হঠাৎ মাথায় কী যে পোকা ঢুকিয়ে আনলো!"

"সব কথা ঠাকুমাকে বলতে যাও কেন বল তো বাপী? এই তোমার এক দোষ!"

বাবা হেসে বললেন, "বাঃ, তুমি তোমার সব কথা তোমার মাকে বলতে যাও না?"

"বারে আমি তো ছোট!"

"মায়ের কাছে সবাই ছোট!"

বলে বাবা হেসে চলে গেলো।

তুলতুল কিন্তু ভাবতে লাগলো, তাই কি? তাহলে টুনির মা টুনিকে কয়লা ভাঙতে বলে কী করে? 'ছোট' ভাবলে কি বলতে পারতো?

আসলে টুনির মা বোকা বলেই।

অবিশ্যি ইস্কুলে পড়লে, মিসদের উপদেশ শুনলে আর বোকা থাকবে না।

কিন্তু—

কিন্তু আর একটা সমস্যা—টুনির মা কী প'রে ইস্কুলে যাবে? টুনির

জন্যে না হয় মাকে পাগল করে একটা ফ্রক ইজের আর সোয়েটার আদায় করে রেখেছে। ওর মা'র জন্যে তো—

তারপর মনে মনে ভেবে দেখল, বড়োদের বোধহয় অতো ফর্সা-টর্সা পরার নিয়ম নেই। থাকলে ওর জন্যেও মাকে 'পাগল' করতে হবে।

উঃ! কী মজাই হবে কাল!

তুলতুল স্কুলে গিয়েই মিসকে জানিয়ে দিতে পারবে—মিস, আপনার কথা শুনেছি। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে তার মেয়েকে—হি-হি, আর তার মাকেও—ইস্কুলে—

'হি-হি'-টা অবশ্য এখনই করে নিল।

মিস-এর সামনে তো চলবে না। তখন তো গম্ভীর শান্ত আর ভদ্র হয়ে কথা বলতে হবে।

রাতে শোবার সময় খুব আহ্লাদ-আহ্লাদ মন নিয়ে শুতে গেল তুলতুল। যদিও বার কয়েক মাকে শাসিয়েছে, "আমার সঙ্গে টুনিকেও তাড়াতাড়ি ভাত খেতে বসিয়ে দেবে। টুনির মা কক্ষনো ওকে ঠিক সময় ভাত দেবে না। যা বোকা! মা……টুনিকেও ভালো জিনিস খেতে দেবে, বুঝলে?"

মা রেগে বলেছিল, "বুঝলাম বাবা, হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, এখন বক্‌বকানি থামিয়ে ঘুমোবে দয়া করে?"

তা ঘুমিয়ে পড়ল তুলতুল তক্ষুনি।

আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—ক্লাশে গিয়ে বলছে, 'মিস, আপনার কথা শুনেছি।'

ও মা! সকালবেলা উঠে এ কী? দেখে কি না যে-কে সেই? বাপীর কোনো তোড়জোড় নেই ওদের নিয়ে যাবার। বাড়ীতেই নেই বাপী, বাজারে চলে গেছে। আর টুনি সেই ছেড়া ফ্রক প'রে চায়ের বাসন ধুচ্ছে। গাদা গাদা তো চায়ের বাসন!

তুলতুল তখন শুধু টুনিকে টানতে টানতে কলতলা থেকে নিয়ে এসে বলেছিল, "কী বলেছিলাম কাল ?"

টুনি বোকার মত ওর মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। ওর মা বলেছিল, "খুকুর কী হল গো ? মাতাটা বেগড়ালো নাকি ?"

তুলতুল ছুটে দোতলায় গিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলা মায়ের কাছ থেকে যে সব জামাটামা নিয়ে রেখেছিল, সেগুলো এনে টুনিকে প'রে নিতে হুকুম দিয়ে বলেছিল, "বাপী এলেই ইস্কুলে যাবি, বুঝলি ? আর তার আগে আমার সঙ্গে ভাত খেয়ে নিবি। মনে থাকবে ?"

একে কি টুনির মাকে 'জ্বালাতন' করা বলে ?

তাকে তো তক্ষুনি ইস্কুলে যেতে বলা হয় নি !

ভাত খেতে বসে টুনিকে না দেখতে পেয়ে তুলতুল যখন ডাকাডাকি করছিল, ঠাকুমা বলেছিলেন, "সে এখন বাড়ি গেছে বাপকে জিগ্যেস করতে।"

"কী জিগ্যেস করতে ?"

"বাঃ, ইস্কুলে যাবে কিনা জিগ্যেস করবে না বাপকে ? তুই বললেই হল ? টুনির মা তাই বাসন ফেলে রেখে মেয়ে নিয়ে জিগ্যেস করতে গেল।"

কথাটায় যুক্তি আছে।

কিন্তু ভয়ও আছে।

ওর বাবা আবার না বারণ করে বসে ! ওদের বিশ্বাস নেই। এই তো তখন টুনির মা বলল, 'গরীবের ছেলেপেলের কি আর নেকাপড়া করলে চলে ?'

মাইনে লাগবে না, বই কিনতে পয়সা লাগবে না শুনে চুপ করলো। ... তা সে কথাটা বাড়িতে বলবে নিশ্চয়।

তুলতুল যখন জুতো মোজা পরছে তখন বাপী ফিরলেন বাজার থেকে। তুলতুল বলে উঠল, "উঃ বাপী। তুমি না একখানা ডেঞ্জারাস ! (এই কথাটা



...উঃ বাপী! তুমি না একখানা ডেঞ্জারাস!

তুলতুলকেই বাপী বলে অনেক সময়) এতো দেরী করলে ?···আর টুনিও দেরী করছে। ও এলেই স্কুলে নিয়ে যেও। 'ভবতারিণী বালিকা বিদ্যালয়'-এ নিয়ে যেও না বাপী, এইতো এখানে! ওখানে না, জুতো মোজা না পরলেও ঢুকতে দেয়, জানো বাপী ? টুনি বেচারীর তো নেই ওসব কিছু। ও যখন পাশ করবে, তুমি ওকে জুতো মোজা কিনে দেবে বাপী ? আহা, ওর বাবার তো বেশী টাকা পয়সা নেই! তাই দেয় না। দেবে তো বাপী ?"

উত্তরটা আর আদায় করতে পারা গেল না, স্কুলের বাস এসে গেল। ···আর এখন বাস থেকে নেমে শুনতে হলো কিনা, টুনির মা তুলতুলের 'জ্বালাতনে' কাজ ছেড়ে দিয়েছে। সেই যে সকালে বাসন-টাসন না মেজে চলে গিয়েছিল, আর আসেনি। পাশের বাড়ির সুখদা ওদের পাড়ায় থাকে, তাকে পাঠিয়েছিল মা, বলেছে আর এ বাড়িতে কাজ করবে না সে।

তার মানে টুনির বাবাকে জিগ্যেস করতে যাওয়াটা বাজে কথা! ইস্কুলের ভয়ে পালালো!

আশ্চর্য! কী বোকা!

টুনি তো টুনির মার নিজের মেয়ে। তবে ? সকালবেলা শীতে কাঁপতে কাঁপতে কাজ করার বদলে টুনি যদি ফর্সা জামা প'রে তুলতুলের সঙ্গে আলুভাজা, মাছভাজা, ডিমসেদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়ে ইস্কুলে যেতো, সেটা খুব খারাপ হতো ?

আকাশ পাতাল ভাবতে থাকে তুলতুল, সবাই বলে বটে 'বড় হয়ে বুদ্ধি হবে', ছাই হয়! হাতি হয়! বরং বড় হলেই বুদ্ধি কমে যায়, গোলমেলে হয়ে যায়।

এই তো বড়রা ? কেউ তো টুনির মার বোকামীর দোষ দিচ্ছে না, দোষ দিচ্ছে তুলতুলের বোকামীর। অথচ ওঁরা তো আর কেউ না-লেখাপড়া শেখা নয় ? ওঁরা তো জানেন শিশুবর্ষে কি কি করতে হয়, কী করা উচিত, শিশুদের জন্যে। রোজই তো খবরের কাগজ পড়েন ওঁরা।

আসলে—বড়দের কিছুই বোঝা যায় না।

তাঁরা একবার একরকম বলেন, আর একবার অন্যরকম!

সব্বাই ওই উল্টোপাল্টা।

সেই যে সেবার জলপাইগুড়িতে মামার বাড়ির দাদু তুলতুলকে একটা 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' কিনে দিলেন, কী বললেন তখন দেবার সময়?

"মহৎ জনেদের জীবনী পড়বে তুলতুল! যত পারবে এইসব পড়বে, বুঝলে? পড়বে আর তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করবে।"

ওমা! তার কদিন পরেই জলপাইগুড়িতে তো খুব ঠাণ্ডা? একটা গরীব ছেলে একটা পুরানো জামা চাইছিল, তুলতুল নিজের গায়ের কার্ডিগানটা খুলে তাকে দিয়েছিল বলে দাদুর কী বকুনি! কী বকুনি! "পাগল", "মাথা খারাপ"—এইসব কত কীই তো বলা হলো তুলতুলকে। কেন? বিদ্যাসাগর কি নিজের গায়ের জামা চাদর খুলে গরীব লোকেদের দিয়ে দিতেন না!

অথচ দাদু তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে হেসে বললেন কিনা—"এই নাক কান মলছি বাবা, আর কাউকে বিদ্যেসাগরের জীবনী কিনে দিচ্ছি না! অ্যাঁ! ওই দামী নতুন জামাটা কিনা রাস্তার ভিখিরিকে দিয়ে দিল মেয়ে?"

আচ্ছা রাস্তার ভিখিরিকে দেবে না তো কি বড়লোকের ছেলে মেয়েদের দেবে? দিতে গেলে নেবে তারা? কেনই বা তা দিতে যাবে তুলতুল? তাদের নেই না কি?

তাহলে বলতে হবে না, বড় হলেই বুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। ভাবতে ভাবতে উথলে ওঠে তুলতুল, এদিকে বলা হয় 'জীবে দয়া করা উচিত', কিন্তু একদিন রাস্তা থেকে একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে এনে তুলতুল মানুষ করতে চেয়েছিল বলে তাকে সবাই এই মারে তো সেই মারে?

"ফেলে দিয়ে আয়! দূর করে ফেলে দিয়ে আয়! একটা ঘেয়ো পচা কুকুরছানা! ছি ছি!"…তবেই বোঝো! 'জীবে দয়া' কথাটির মানেটা কী?

লোকের বাড়ির আদুরে পোষা কুকুর বিড়ালকে কি দয়া করতে যাবে তুলতুল ?

নীচে থেকে দাদার গলা শোনা গেল, "অ্যাই তুলতুল খাবি আয় না। ছাতে গিয়ে বসে আছিস কেন ?"

তুলতুলের মনটা দুলে ওঠে। পেটটার মধ্যে কেমন যেন করছে তবু তুলতুল শক্ত হয়ে বসলো ! এইটুকুতেই কাতর হবে সে ?···মিস না বলেছেন—'কতো ছেলেমেয়ে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—'

আবার ডাকল দাদা, "বাসন মাজার ভয়ে নীচে নামছিস না বুঝি ? হি-হি হো-হো হা-হা—থাক অত ভয়ে কাজ নেই, তোর শাস্তি মাপ করা হচ্ছে—"

তুলতুল চেঁচিয়ে বলতে চাইল, 'শাস্তি আবার কী ? আমি কি কিছু দোষ করেছি ?'···কিন্তু বলতে পারল না। গলাটা যেন বুজে আছে।

এরপর ঠাকুমার গলা—

"এই তুলতুলি, লুচিগুলো যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল !"

তুলতুল মুখ শক্ত করে বসে থাকল।

এরপরেই মা এলো।

"এই কী ঢং হচ্ছে ? তোকে কি সত্যি বলা হয়েছে 'বাসন মাজ্, কাপড় কাচ্' ? এই শীতের সময় কাজের লোক ছেড়ে গেলে কী হয় তা আর বুঝবি কি ? সাধে কি আর বকা হয়েছে ?···নে নে চল। খেতে চল। আর ঢঙে কাজ নেই।"

ঠাকুমার ডাকে মুখটা শক্ত হলেও মনটা একটু নরম হয়ে আসছিল, মায়ের কথায় আবার কঠিন হয়ে গেল। 'ঢং' করছে সে ? তার বুঝি মনে কষ্ট হচ্ছে না ?

রেগে বলল, "যাব না যাও। খাবো না আমি।"

"ঠিক আছে। আসুন তোমার আদরের বাপী ; মেয়েকে আহ্লাদ

দেওয়ার মজা দেখুন! বলা হলো—'তা সত্যি টুনিকে ইস্কুলে দিলেই হয়!'··· দিলে ওর মা'র চলবে? কত সাহায্য করে টুনি।"

তুলতুলের এখন গলায় জোর—"সেইটাই তো খারাপ! মিস বলেছেন, 'ছোট বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানো খুব পাপ।' বুঝলে? তোমরা সবাই পাপী।"

মা কিন্তু এই ভয়ানক কথাটা শুনেও ভয় খেলো না। বরং হেসে হেসেই বলল, "কী আর করবো বল? পাপীতাপীর সংসারে জন্মেছি, পাপী-তাপী হয়েই আছি। এই পৃথিবীটাকে স্রেফ উল্টে ফেলে, একেবারে গোড়া থেকে বদলে ফেলার ক্ষমতা তো নেই! আর তা না করলে উদ্ধারও নেই!···তুই বড় হয়ে বদলে ফেলিস। তুই আর তোর বন্ধুরা। তোরা আর আমাদের মত পাপ করিস না।"

ওমা, এই কথায় যে কী হল!

কোনোখানে কিছু না, তুলতুল হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে, "আর আমিও যদি বড় হয়ে তোমাদের মতন উল্টোপাল্টা হয়ে যাই? যদি বোকা হয়ে যাই? যদি ভুলে যাই সব মানুষই সমান?"

ভূত মানালেন প্রফেসর জ্ঞানেশ

বাড়িতে কিছুদিন ধরে যে ঘটনাটি ঘটে চলেছে, সেটা যে 'অ-লৌকিক' একটা কিছু—এ বিষয়ে বাড়ির সকলেই প্রায় একমত হয়ে পড়েছে। শুধু ওই অ-লৌকিকটি ভৌতিক না ভগবানিক, সেটা নিয়েই একটু মতভেদ রয়েছে এখনো।

বুবুনের ঠাকুমার গোড়া থেকেই মত—ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভগবানিক এবং তিনি তাঁর মত থেকে এক ইঞ্চিও নড়ছেন না, আর ঠাকুমার এই দৃঢ়তা দেখেই বোধহয় ক্রমশঃ বুবুনের জ্যেঠিমাও তাঁর সমর্থক হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বুবুনের মা আর কাকিমা পুরোপুরি ভূতের সপক্ষে। ওঁদের মতে—আদি অন্তকাল থেকে ভূতেরাই তো যত অঘটন ঘটানোর নায়ক, তাদের এই চিরন্তন অধিকারে হঠাৎ ভগবান কেন নাক গলাতে আসবেন?

কিন্তু বুবুনের বাবা আর জ্যাঠামশাইয়ের কেস আলাদা। বাবা যতদিন বলেছেন 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না—' জ্যাঠামশাইও ততদিন বলে এসেছেন—'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

আর যেদিন বুবুনের বাবা অর্থাৎ বাড়ির মেজবাবু দেবেশ বর্মন হঠাৎ বলে উঠলেন, 'নাঃ ঘটনাটা অলৌকিক বলেই মনে হচ্ছে—' ঠিক সেইদিন থেকেই জ্যাঠামশাইও বলতে শুরু করলেন, 'হ্যাঁ ডেফিনিট্‌লি অলৌকিক। তাছাড়া কিছু হতেই পারে না।'

আবার হঠাৎ যদি কোনোদিন, মানে 'যদি'র কথা বলছি—মেজবাবু বলে ফেলেন, 'ব্যাপারটা ভগবানিকও হতে পারে' তো বড়বাবু তৎক্ষণাৎ ঘোষণা করে বলবেন, 'নির্ঘাৎ ভগবানিক, তাছাড়া কিছু নয়।'

৩

বড়বাবুর এ অভ্যেস চিরকালের।

তবে ঠাকুমা বলেন, "চিরকালের নয়। সেই যে পিঠোপিঠি দুই ভাই একই সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন এগজামিন দিয়ে দেবু ফাস্ট ডিবিশনে পাশ করলো, আর দ্বিজু থার্ড্ ডিবিশনে, সেই অবধি দ্বিজু ছোট ভাইকে গুরুতুল্যি দেখে আসছে।"

বুবুন অবশ্য বোঝে না এতে 'গুরুতুল্য' দেখবার কী আছে। এই যে বুবুন তার জ্ঞান অবধি ঠাকুমার উচ্চারণের ভুল শুধরে আসছে তার জন্যে কি ঠাকুমা বুবুনকে 'গুরুতুল্য' দেখছেন? মোটেই না। বরং গ্রাহ্যই করেন না। সেই ম্যাট্রিককে 'ম্যাট্রিকুলেশন বলবেন, ডিভিশানকে ডিবিশন। আর বুবুন যত বলবে এগজামিন বলার থেকে তুমি বরং পরীক্ষা বোলো ঠাকুমা, তা কানেও নেবেন না। সেই এগজামিনই বলে চলবেন। বুবুনের কথা যেন কথাই নয়।

তা সে যাক। বাড়ির মধ্যে একজন কিন্তু কারুর সমর্থক নয়, তিনি স্বতন্ত্র। তিনি হচ্ছেন ছোটবাবু অর্থাৎ বুবুনের কাকা ডঃ জ্ঞানেশ বর্মন। কোন্ যেন একটা কলেজের প্রফেসর তিনি। বিজ্ঞানের ছাত্র। বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই। তিনি এইসব অজ্ঞানতা বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাই ভূত, ভগবান, অলৌকিক কাউকেই স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। এমন কি দুর্বোধ্য রহস্যকেও নয়।

বলছেন, ঘরে সংসারে এমন কোনো ঘটনা ঘটতেই পারে না, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। চোর নামের একটা প্রাণী নেই জগতে?

অথচ যে রকম অবিশ্বাস্যভাবে চাবিবন্ধ আলমারির মধ্যে থেকে, অথবা ছিটকিনি লাগানো ঘরের মধ্যে থেকে, কিম্বা হঠাৎ চোখের সামনে থেকেও বাড়ির সব জিনিসপত্র অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, সেভাবে জিনিস অদৃশ্য করা চোরের গুরুদেবেরও সাধ্য নেই। তাহলে?

যাচ্ছে কীভাবে? সিঁধ কাটছেনা, চাবি ভাঙছেনা—

প্রথম কবে থেকে যেতে শুরু করেছিল, সেটা বলা শক্ত। প্রথমটা

কে অত খেয়াল করেছে? দরকারের থেকে অনেক বেশী জিনিস থাকলে, আর বাড়িতে অনেক লোক থাকলে চট করে ধরা পড়েনা কোথাও কিছু কমছে। মনে হয়, কে হয়তো কোনোখানে রেখেছে। তাছাড়া—কমতি না পড়লে খেয়ালে আসবে কেন?

ধর, বুবুনের বাবার চটির শখ, তাঁর সাত জোড়া চটি, সেই সাত জোড়া চটির থেকে যতদিনে চার জোড়া চলে গেল ততদিনে নজরেই এলো না তাঁর জুতো কমে গেছে।

বুবুনের কাকিমার শাড়ির শখ—(এতো বেশী শখ যে অত বড় বড় দুটো আলমারিতেও ধরতে চায়না, পাল্লা খুললেই দুমদাম পড়ে যেতে শুরু করে শাড়িরা) অতএব তাঁর অগুনতি শাড়ি। তার থেকে অনেক গোছা শাড়ি হাপিস্ হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত টের পাওয়া সম্ভব? বুবুনের জ্যেঠিমার বেড কভার কেনা বাতিক, বেড কভার কিনে কিনে দেরাজ বোঝাই করেন তিনি। সেই বোঝা থেকে বেশ কিছু হাওয়া না হওয়া পর্যন্ত টের পাবেন কি করে? স্টকে হাত পড়ার তো দরকারই পড়েনা। বিছানার সঙ্গেই তো কতো রয়েছে!

এ সংসারে 'স্টক' করার বাতিক কার নেই?

সকলেরই কিছু না কিছু আছে। বাতিকই বল, আর হবিই বল। দরকারের বেশী টাকা থাকলে যা হয় আর কি! বিনা দরকারে জিনিস কেনা।……বড়বাবু অর্থাৎ দ্বিজেশ বর্মনের বাতিক হচ্ছে রেশন স্টক করা। তাঁর ধারণা তৃতীয় মহাযুদ্ধ আগতপ্রায়। আর এসে গেলেই তো খাদ্যদ্রব্যরা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। তাহলে? তখন উপায়?

এতোগুলো লোকের সেই খাদ্যহীন দিনের বুভুক্ষু অবস্থা কল্পনা করে জ্যাঠামশাই মরীয়া হয়ে রেশন স্টক করে চলেছেন। সিঁড়ির মাথার ঘরটা মেঝে থেকে মাথা অবধি জ্যাঠামশাইয়ের অবদানে বোঝাই। বস্তা বস্তা চাল, বস্তা বস্তা গম, টিন টিন ডাল মশলা নুন চিনি, ড্রাম ড্রাম তেল ঘী দালদা, কৌটো কৌটো চা, গুঁড়ো দুধ, কোকো কফি, বোতল বোতল হর্লিকস ভিভা বেবিফুড, কী নয়?

বেবি তো একটাই রয়েছে বাড়িতে! ছোট বর্মনের মাস ছয়েকের মেয়েটা। তবে সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত দিনটি আসতে আসতে সে আর বেবিফুড খাবার বয়েসে থাকবে কিনা জ্যাঠামশাইই জানেন!

শুধু বিস্কুটের স্টকটা ছাতের ঘরে ওঠে না, খাবার ঘরেই রাখতে হয়, কারণ ঠাকুমার ভাঁড়ারে বিস্কুটের প্রবেশ নিষেধ। আর কেউ না জানুক, ঠাকুমা তো জানেন, বিস্কুট তৈরি হয় মুর্গির ডিম দিয়ে। ময়দার সঙ্গে ডিমের গোলা না মিশোলে নাকি বিস্কুট খাস্তা হয় না! এ তথ্য ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমার কাছে জেনে রেখেছিলেন। সে জানা তো আর নড়চড় হতে পারে না? ঠাকুমার ঠাকুমা হচ্ছেন মহারানীর আমলের লোক। মহারানীর ঝুঁটিবাঁধামুখ টাকা ছিল তাঁর কাছে।

তা ঠাকুমার এই 'ভুলজ্ঞান'টা শোধরাবার চেষ্টা করে না বুবুন। বুবুনের জ্যাঠতুতো দাদা বেবুনও কখনো না। যে এখন নরেন্দ্রপুরে পড়তে গেছে। শ্রীরামপুরের ছেলেকে যে কেন নরেন্দ্রপুরে পড়তে পাঠানো হল তা ভগবানই জানেন। বুবুন তো প্রতিবাদ প্রশ্নও তুলেছিল—"গুরু বড়, না শিষ্য বড়? শ্রীরাম আর শ্রীরামকৃষ্ণে তফাৎ কি? আর নরেন্দ্র মানেই তো বিবেকানন্দ।" কিন্তু এমন বাড়ি বুবুনদের, যে কেউ আর কথা কানে তোলে না, 'হা হা' করে শুধু হাসে!

দাদা চলে যাওয়ায় কি বুবুনের কম অসুবিধে ঘটেছে? কে বোঝে সেটা? অবিশ্যি জ্যাঠামশাইয়ের আর দোষ কী? বুবুনের ফার্স্ট ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশকরা বাবাটি কথাটি না তুললে তো আর হতো না এটি? জ্যাঠামশাইয়ের মাথাতেই আসতো না! শোনা যাচ্ছে, এরপর বুবুনকেও সেখানে পাঠানো হবে! হোক ভালই! তবে সেখানে দাদা বলে স্পেশাল করে খেলতে দেবে কি না কে জানে!

কী আর করা! আপাতত বুবুনকে একাই সেই অছুৎ মালকে ম্যানেজ করতে হচ্ছে। উপায় কী? বিস্কুটের ওই বৃহৎ বৃহৎ টিনগুলোকে তো আর তৃতীয় মহাযুদ্ধের অপেক্ষায় ফেলে রাখা যায় না। মিইয়ে গিয়ে তো অখাদ্য হয়ে যাবে!

মুড়ির স্টকটার ভার নিয়েছে যোগীন্দর। সে তো মিইয়ে গেলেই বাতিল।

জ্যাঠামশাই অবশ্য এসব খবর রাখেন না, তাই তিনি মাঝে মাঝেই দরাজ গলায় অবহিত করান, সাধে কি আর স্টক করি রে? এমন দিনও আসতে পারে—হয়তো শুধু দুখানা করে বিস্কুট একমুঠো মুড়ি খেয়েই দিন কাটিয়ে দিতে হবে। তখন ওই এয়ারটাইট টিনগুলোই ভরসা!

কিন্তু তৃতীয় মহাযুদ্ধ যেন কড়ের সর্দার, আসতে গড়িমসির আর শেষ নেই। তাই জ্যাঠামশাইকে মাঝে মাঝেই সেই সিঁড়ির ঘর ইন্‌স্‌পেক্‌শন করতে যেতে হয়, পোকার আবির্ভাব ঘটছে কি না দেখতে, কিন্তু সে তো 'মাঝে মাঝে'! তার মাঝে অদৃশ্য বা ভৌতিক হস্তক্ষেপে ক্রমশঃই যে টাইট বস্তারা ঢিলে হতে থাকে, ভর্তি টিনেরা পৌনে হয়ে যায়, কৌটো বোতলরা ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা হয়ে পড়ে, এ তো আর চট করে বোঝবার কথা নয়! কাজেই বাড়ির সর্বত্র, বলতে গেলে শিরায় শিরায় যে একটা অদৃশ্যলীলা চলছে তা প্রথমে কারো নজরে পড়েনি।

প্রথম নজরে এলো ঠাকুমার।

কারণ বাড়ির মধ্যে তাঁর নজরটাই সব থেকে তীক্ষ্ণ। বুড়ো বুড়ো ছেলেদের শার্ট-ঢাকা প্যান্ট-আঁটা পেটটি দেখেও তিনি ধরতে পারেন ভাল করে ভরেছে কি ভরেনি। তা সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেই হঠাৎ ধরা পড়ল, রান্নাঘরে বাসনের তাক যেন হালকা হালকা ফাঁকা ফাঁকা। চেঁচিয়ে উঠলেন, "রান্নাঘরে বাসন এতো কম কেন যোগীন্দর?"

যোগীন্দর নির্লিপ্ত গলায় বলল, "বোধহয় সব মাজা হয়নি।"

"মাজা হয়নি তো উঠনেই বা পড়ে কই?"

ঠাকুর যোগীন্দর ঝা আরো নির্লিপ্ত হল, "তবে আছে কোথাও ইদিক সিদিক।"

বলতেই পারে। বাড়ির পা থেকে মাথা পর্যন্ত সর্বত্রই তো বাসন। ঠাকুমার যে ওইটিই হবি। ওই বাসন কেনা। আজীবন কাল বাসনই কিনে

চলেছেন তিনি। কাঁসা, পিতল, তামা, জার্মান সিল্‌ভার, স্টেনলেস স্টিল, এনামেল, অ্যালুমিনিয়ম এমন কি হিন্দালিয়াম, প্লাস্টিক পর্যন্ত! ···রান্নাঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, খাবার ঘরে, পূজোর ঘরে, কোথায় না বাসনের ছড়াছড়ি? এছাড়া সিন্দুকে তো গাদাগাদি!

তবু কম্‌তিটা তাঁর নজরে পড়ল? 'কোথায় কমতি?' সবাই ঠাকুমার বাসনের বাতিক নিয়ে হাসাহাসি করল, আর যোগীন্দর ঝা গম্ভীর মন্তব্য করল, "মাঈজীর তো শুধ্‌ বাসন আর বাসন। যাবে কোথা? ওদের পা আছে, না ডানা আছে?"

বারো বছর বয়সে দ্বারভাঙার এক গণ্ডগ্রাম থেকে এ বাড়িতে এসে ঢুকেছিল যোগীন্দর। এখন বাহান্নয় পা দিয়েছে। বুবুন বলে, ঠাকুমার থেকে ও ভাল। আর বাড়ির কাউকেই সে কেয়ার করা দরকার মনে করে না। কিন্তু সেই যোগীন্দর বেশিদিন নয়, দুদিন পরেই নিজেই হঠাৎ হাঁক পাড়ল, "আমার ডাল রান্নার ডেকচিটা কোথায় গেল?" তারপর পরপর তুমুল হাঁক—"চাল ধোবার গামলাটা কই?" "তরকারি ধোবার পেতলের বালতিটা?"···"ঝোল ঢালবার এল্‌মেলের বড় কাঁসি দুটো?···"অ্যাল্‌মনির পরাতগুলো?"···"কই? কই? কই?" মুহুর্মুহু গলা শোনা যাচ্ছে যোগীন্দরের। অ্যাল্‌মনি অবশ্য অ্যালুমিনিয়াম, আর এল্‌মেল হচ্ছে এনামেল! তাতে কিছু এসে যায় না। বোঝবার পক্ষে ওই যথেষ্ট।···ক্রমেই দেখা গেল আরো অনেক কিছুই হাওয়া হয়ে গেছে যোগীন্দরের দপ্তরের। ছোট হাঁড়ি নেই, মাঝারি ডেকচিরা দুজন নেই, আল্‌টুবাল্‌টু কাঁচের গেলাশের কতগুলো নেই। এই গেলাশগুলো যোগীন্দর আর মোক্ষদার যখন-তখন চা খাবার। কিছুদিন হল আর একটা ছেলে এসে জুটেছে। বান-ভাসি হয়ে কোথা থেকে যেন ছিটকে এসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, বড়বাবু বাজারের রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন।···রোগা হ্যাংলা এতোটুকুন ছেলেটা, কিন্তু চায়ের আসরে দিব্যি নাম লিখিয়ে ফেলেছে।

তা' ফেলেছে ফেলুক, কিন্তু গেলাশগুলো কোথায় ফেলল?



...মোক্ষদা আড়ালে রেগে উঠল...কোন্ কাজটাই বা করে বড়বাবুর পুষ্যিপুত্তুরটি...

বড়বাবু শুনতে পেয়ে বললেন, "ওকে বকছ কেন ঠাকুর? ও কাঁচের বাসন ধোয়?"

মোক্ষদা আড়ালে রেগে উঠল, "ধোয় না, তা সবাই জানে। কোন্ কাজটাই বা করে বড়বাবুর পুষ্যিপুত্তুরটি, চারবেলা খাওয়া ছাড়া? আমি যা পাই সব মেজে তুলি, হ্যাঁ"!"

বাসন নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছিল না, বাদে ঠাকুমা আর ঠাকুর। কিন্তু হঠাৎ আর এক চীৎকার।...বুবুনের বাবার গলা, "আমার চটিগুলো কে কোথায় ফেলেছে? যেটা পরতে যাই খুঁজে পাই না?"

ওনার নিজের বৌই (মানে বুবুনের মা) অগ্রাহ্য করে বললেন, "তোমার চটি আবার কে কোথায় ফেলবে? কারো পায়ে হয়?"

—হোক না হোক গেছে কোথাও।

—কোথাও যায়নি বাড়িতেই আছে। দেখোনা সিঁড়ির তলায়, খাটের

নীচে, খাবার ঘরের টেবিলের ধারে, কি বসবার ঘরে সোফার আড়ালে। যেখানে সেখানে ছাড়ো।

কিন্তু নাঃ কোথাও নেই। সাত জোড়া চটির চার জোড়া নেই। তবে কী ভাগ্যিস নেহাৎ নতুনগুলো যায়নি, কিন্তু গেল কী করে? চটি হাপিস করে দেবার মত লোক কে এসেছে বাড়িতে?

তবু মেজবাবুর চটি নিয়েও কেউ তেমনি মাথা ঘামাল না। আছে কোথাও। মাথা ঘেমে উঠল বুবুনের কাকিমার আর্তনাদে, "আমার অনেক শাড়ি পাচ্ছি না।"

—সে কী? শাড়ি পাচ্ছ না?

—হ্যাঁ আমার সেই লাল চৌখুপি ডুরেটা,—সেই নীল ডোরা তাঁতেরটা, সেই সবুজ ছাপাটা, সেই হলদে কালো মিশোনোটা—ওঃ সেই গোলাপী বুটি দেওয়াটা—সেই সোনালী পাড় খয়েরিটা—ও হো-হো সেই তুঁতে রঙেরটা—নস্যি রঙেরটা—আ আ—আঁ—

—বল কী? কী কাণ্ড। ছিল কোথায়?

—কোথায় আবার? আলমারিতে। এলোমেলো মত হয়েছিল তাই গোছাতে গিয়ে—

ডঃ জ্ঞানেশ বর্মন যদিও ছোটখাটো গোলমালে কান দেন না, তবে গোলমালটা ক্রমশ উত্তাল হয়ে ওঠায় নিজের স্টাডি রুম থেকে "এতো হৈ-চৈ কেন?" বলে এসে ব্যাপারটা শুনে অবহেলায় বললেন, "যেসব কাপড়ের কথা ভাবছ, সেসব হয়তো তোমার আগে ছিঁড়ে গেছে।"

কাকিমা রেগে লাল হলেন, "ছিঁড়ে গেছে? ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ি নিয়ে আমি হৈ-চৈ করছি?"

—তা তোমার এই এতো-এতো কাপড়ের হিসেব থাকে? অসম্ভব। দুতিন আলমারি কাপড়—

কাকিমা আরো রেগে বললেন, "তোমার ওই চার আলমারি বইয়ের হিসেব থাকে না?"

"বইয়ের সঙ্গে কাপড়ের তুলনা ? কী অ্যাবসার্ড চিন্তা!" বলে চলে গেলেন জ্ঞানেশ।

তা যান—

কাকিমা তখনো বলে চলেছেন, "ও দিদি, আমার সেই 'মাল্‌টি কালার' প্রিন্টেরটাও যে দেখতে পাচ্ছি না, আর সেই অরেঞ্জ পাড় সাদা শাড়িটা…… ?"

শুনতে শুনতে দিদিরও ভয় জন্মে গেল। দিদি মানে বুবুনের জ্যেঠিমা আর কি! তিনি চট করে দেরাজ খুলে তাঁর সম্পত্তি দেখতে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।…না তিনি বেশী হৈ-চৈ করেন না, তিনি শুধ্‌ বললেন, "এক গেলাশ জল।…আর বললেন, "পাখাটা খুলে দাও।"

গায়ের শালটা খুলে ফেললেন।

তাঁরও একই ব্যাপার।

চাবি বন্ধ দেরাজের মধ্যে থেকে বেশ বড় একটি খাবোল!

দেখে শুনে বুবুনের মাও ভয়ে ভয়ে নিজের বাতিকের মালগুলি দেখতে এলেন। কী জানি বাবা, যা হচ্ছে বাড়িতে! তাঁর তো আবার চাবি-টাবির বালাই নেই, খোলা বেতের ঝাঁপির মধ্যেই পড়ে থাকে।…কিন্তু না তাঁর সব ঠিক আছে। গুণে গুণে দেখলেন, যতগুলো পশমের গোলা ছিল সবই অটুট।

ওইটিই তো বাতিক বুবুনের মা'র! শীত পড়ল কি রাশি রাশি পশম আসতে লাগলো তাঁর। তা' কী ভাগ্যি তাঁর ঝাঁপিতে অশরীরীর হাত পড়েনি!

অশরীরীই বলতে হয়! সিঁধ কাটলো না, চাবি ভাঙলো না, 'এসেছে' এমন চিহ্নমাত্তর নেই অথচ—

হ্যাঁ অথচ জিনিসপত্তর উড়ে যাচ্ছে।

এতোদিন সবাই অন্যমনস্ক ছিল, এখন হঠাৎ সবাই সচেতন হয়ে উঠেছে, আর বাড়িতে সর্বদাই যখন তখন আর্তনাদ উঠছে, "এ কী! পাঁচটা হারিকেনের মধ্যে মোটে তিনটে পড়ে। আর দুটো?"…"ও মা—ছাতাগুলোও তো সব নেই! সেই বাজে বাঁটওলাটা?"…সেই রং-জ্বলে-যাওয়াটা? সেই পেল্লায়—ঢাউশটা?"

এতোবড় সংসারে অবশ্য ছাতার গুণ্‌তি থাকে না, ভাল মন্দ শৌখিন অশৌখিন কত রকম, তবে বেশ কয়েকটা যে গেছে তাতে সন্দেহ রইল না।

কিন্তু শুধুই 'গেছে'?

যাওয়াটা থেমে গেছে?

মোটেই না। সারাক্ষণই কিছু না কিছু যাচ্ছে।

শতরঞ্চি, মাদুর, বালতি, মগ, গামছা তোয়ালে, কী নয়? এমন কি কাপড়-কাচা সাবান পর্যন্ত। এই ছিল, এই নেই। এই রেখে গেছ, এই লোপাট। শুনে শিউরে উঠতে হয়। বাজারের থলিটা নামিয়ে রেখে মাছের হাত ধুতে গেছে যোগীন্দর, ইত্যবসরে তার থেকে কপি কমে গেছে, বেগুন কমে গেছে, আলু, মূলো শিম—সবই কমে গেছে।

হতে পারে, ঠাকুমার কবলে পড়ে গেলে মাছের হাত ধুতে কিছু কিঞ্চিৎ বেশী সময় লাগে, তাই বলে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে তার মধ্যে? জীবনে কখনো এমন ঘটেছে এই বর্মন বাড়িতে? তাছাড়া—যদি দৃশ্যমান কোনো হাতের হাত পড়ত সে কি পুরো থলিটাকে ছোঁ মেরে উড়িয়ে না নিয়ে গিয়ে কিছু কিছু নেবার পদ্ধতি অবলম্বন করতো?

এর পরও বাড়ির ছোটবাবু প্রফেসর জ্ঞানেশ বর্মনের অভিমতে মত মিলিয়ে বলতে হবে 'অলৌকিক' বলে কিছু নেই জগতে?

তাও হয়তো তাঁর কাছে নস্যাৎ হবার ভয়ে মনে মনে না মানলেও মুখে বলতো, কিন্তু সেদিন বড়বাবু দ্বিজেশ বর্মনের সিঁড়ির ঘর থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে নীচে নেমে আসার পর আর কেউ মুখেও বলছে না প্রকাশ্যে জোর গলায় (জ্ঞানেশকেই নস্যাৎ করে দিয়ে) ঘোষণা করছে,—"এ অদৃশ্য হাতের কাজ।"

তবে ওই দুটো দল গড়ে উঠেছে।

এক দলের মতে ব্যাপারটা 'ভৌতিক,' আর অন্য দলের মতে, 'না, ভগবানিক।' কিন্তু ভূতের দলটাই দলে ভারী। এ দলে যোগীন্দর ঝা মোক্ষদা দাসীও এসে জুটেছে কিনা!

ভূত। ভূত ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না। ভূতের সমর্থকরা বলছে, "ভগবানের আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই? তাই এইসব হিজিবিজি জিনিস চুরি করে মরছেন? ... হ্যাঁ 'ননীচোরা' বলে একটা নাম তাঁর আছে বটে, কিন্তু তাই বলে বাসন, কাপড়, চাদর, চটি, ছাতা, মাদুর, বালতি, হারিকেন, গামছা, তোয়ালে, চাল, গম, আলু বেগুন, এমন কি কাপড়কাচা সাবান পর্যন্ত? আঃ ছি-ছি ভগবানের নামে এ কি বদনাম? এ হতেই পারে না।"

ভগবানিক সমর্থকরা বলছেন, "তবে বলি ... ভূতকে কখনো কেউ হারিকেন জ্বালতে দেখেছ? বেডকভার পেতে বিছানায় শুতে? দেখা তো দূরের কথা, শুনেছ কখনো ভূতেদের কাপড় চাদর ছাতা জুতোর দরকার হয়? মানুষকে হাতে পেলে শুনেছি ধরে আছাড় দেয় তারা, কিন্তু সাবান ঘষে কাপড় আছড়াতে শুনেছ? ভূতের জীবনযাত্রায় যদি সাবানের ব্যবহার থাকতো, তাহলে আর হাড্ডি নোংরা লোকেদের ভূতের সঙ্গে তুলনা করা হয় কেন? ভূতেরা কি চান করে? তাই তাদের গামছা তোয়ালে বালতি মগে দরকার পড়বে? এ সবই হচ্ছে ভগবানের খেলা।" বলে 'ভগবানিক-বাদি' জ্যেঠিমা হাঁফ জিরোতে থামেন।

এই ফাঁকে ভৌতিকে বিশ্বাসী কাকিমা বলে ওঠেন, "আর ভগবানেরই বুঝি ওই সব লাগে?"

ব্যস সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এলেন ঠাকুমা। বললেন, "বল কি ছোট বৌমা? ভগবানের আবার কোনটা না লাগে? কোন জিনিসটায় দরকার নেই তাঁর? দেখগে যাও দেব মন্দিরে মন্দিরে কি ঠাকুরবাড়ি টাড়িতে— সক্কালবেলা মুখ ধোবার জল থেকে রাত্তিরে মশারি ফেলা বিছানায় শোয়া পর্যন্ত—কী না লাগে ঠাকুরের? কাপড়, গামছা, 'ছত্র পাদুকা', চানের জল, আঁচানোর জল, পান মশলা—আর খাবার ব্যাপারে তো কথাই নেই। মানুষের চারবার ভোগ, ওনাদের চৌষট্টি ভোগ। বলে কি না ভগবান এসবে কী করবেন? হুঁঃ কী না করবেন? সবই তাঁর লীলা।"

কাকিমা এই জোরালো যুক্তিতে প্রায় কোন্‌-ঠাশা হয়ে গিয়ে বলেন, "বাঃ ভগবান কি ওসব চান? মানুষে শখ করে দেয় তাই—"

ঠাকুমা আরো জোরালো হলেন, "ভগবান না চাইলে মানুষের কী সাধ্য ছোট বৌমা যে তাঁকে দেবে? এ বাড়িতে কেউ দিচ্ছেনা, তাই নিজেই নিচ্ছেন।"

কাকিমা আবার তর্কে নামেন, "কিন্তু বিস্কুটের টিনগুলো ফাঁকা হয়ে গেল কেন, ভগবান কি বিস্কুট খান? অতো শুচিবাই; গঙ্গাজল ছাড়া চলেনা!"

ঠাকুমা অগ্রাহ্যভরে বলেন, "তা 'কাল'টি যে মেলেচ্ছকাল ছোট বৌমা! এ কালের ভগবানের হয়তো তোমাদের বিস্কুট পাঁউরুটি খাওয়া দেখে খেতে মন হয়েছে! ...তাছাড়া দেখেছ লক্ষ্য করে, জিনিসপত্তর ওড়াচ্ছেন বটে, তবে বুঝে বুঝে। ভালগুলি রেখে নীরেসগুলি ওড়াচ্ছেন। তার মানে গেরস্তর ওপর মায়া রয়েছে। ভূতের তা থাকে?"

কাকিমাতে আর ঠাকুমাতে যখন তর্কযুদ্ধ চলছে, তখন বুবুনের বাবা সেখানে এসে পড়ে বলে ওঠেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মা'র কথাই ঠিক। এ কাজ ভগবানই করছেন মনে হচ্ছে..."

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাঠামশাই ঘরের মধ্যে থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "ডেফিনিটলি ভগবান। তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আমাদের নিয়ে মজা দেখছেন আর কি!"

এর পর আর প্রফেসর বর্মন চুপ করে থাকতে পারলেন না, স্টাডি-রুম থেকে বেরিয়ে এসে সতেজে বললেন, "তর্ক থামানো হোক। ভূতও নয়, ভগবানও নয়, স্রেফ চোর। দুর্দান্ত চালাক কোনো চোর চালিয়ে যাচ্ছে এসব।"

চোর মানে মানুষ চোর।

দুদলই জোরে মাথা নাড়ে, "অসম্ভব। চোর হলেও মানুষ তো! সে কি অদৃশ্য হবার মন্তর জানে?......দেখলে তো সকালে—টেবিলের ওপর থেকে আইডিনের শিশিটা কীভাবে উড়ে গেল? তক্ষুনি রেখে গেছি! চোরের আইডিনের শিশির কী দরকার?"

জ্ঞানেশ বর্মন তেজের গলায় বলেন, "আর তোমাদের ওই ভূত কিম্বা ভগবান, তাদেরই বা কার দরকার? বরং চোরেরই দরকার। পাঁচিলে উঠ্‌তে কি পাইপ বেয়ে ছাতে উঠ্‌তে হাত পা ছড়তে পারে। পাহারা বসাও পাহারা বসাও, দেখি কেমন না চোর ধরা পড়ে।......"

পাহারাটা আর কোথায় বসানো হবে শুনি? সদর খিড়কি দুটো দরজাই তো একশোবার চাবি লাগানো হচ্ছে!

তেমনি দুশোবার খোলাও হচ্ছে।......"এই বুবুন, তোর তো ছুটি চলছে। তুই আর ওই পচা না বোঁচা তোরা পাহারা দে।"

বুবুন বলে, "আমি কী পাহারা দেব? বাঃ। ভূত ভগবান শুনলেই তো আমার ভয় করে। হ্যাঁরে বোঁচা? করেনা? ভূতে ভয় পাইনা আমি?"

নতুন চাকর বোঁচা মিনমিন করে বলে, "তা'তো পাও। রাতের দিকে ছাতে উঠলেই তো—"



নতুন চাকর বোঁচা মিনমিন করে বলে, ''তা'তো পাও''

বলেই চট করে চলে যায়।

আর জ্ঞানেশ বর্মন কিছুক্ষণ সেই দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ জ্ঞানগর্ভ গলায় বলে ওঠেন, "বুঝেছি। ওই ব্যাটাই চোর। ওটা আসা পর্যন্তই এইসব চলেছে—"

"বোঁচা। ওই বোঁচা। ওই রোগা হ্যাংলা নাকে সর্দি কেলে চামচিকেটা?"

হাসির ধূম পড়ে যায় বাড়িতে।

মেজবাবু বলে ওঠেন, "কী যে বলিস গেনু? ওর বলে উত্তুরপূব জ্ঞান নেই, ও করবে চুরি?"

সঙ্গে সঙ্গে বড়বাবু বলে ওঠেন, "ঠিক কথা গেনু। ও করবে চুরি? আর যদি চুরিই করবে, তাহলে কিছু রেখে কিছু নেবে কেন? এই তো কাল সন্ধ্যেবেলা ড্রয়ার থেকে আমার পার্স টা হাওয়া হয়ে গিয়েছিল, বলিনি কাউকে, আজ আবার দেখি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। তার মধ্যের একশো টাকার নোট দুখানাও আছে, শুধু খান তিনেক দশ টাকার নোট ছিল, সেগুলো নেই। তাহলেই বল? চোর তার চুরির মাল কিছু নিয়ে আবার ফেরৎ রেখে যায় শুনেছিস কখনো? মানে আছে এর?"

জ্ঞানেশ বর্মন বলেন, "খুব মানে আছে! একশো টাকার নোট ভাঙাতে সাহস হয়নি, লোকে ওর চেহারা আর বয়েস দেখে সন্দেহ করতে পারবে ভেবে—আচ্ছা ঠিক আছে, আমিই ধরছি চোর। চোখ রাখলেই চোর ধরা যায়।"

ঠাকুমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেন, "ভূত মানে না, ভগবান মানে না, এ ছেলের কী হবে দ্বিজু?"

—কান্নাকাটি কিসের? কান্নাকাটি কিসের? কিছু হবেনা।

এই বলে দেবু দ্বিজু সরে পড়েন।

আর অন্যসকলে উঠে যাবার পর মোক্ষদা আর যোগীন্দর গম্ভীরভাবে আলোচনা চালায়, গ্রামে ঘরে কী ভাবে ভূত তাড়ায়। সে ব্যবস্থায় ভূত 'বাপ

বাপ' তো বটেই 'দাদু দাদু' 'দিদা দিদা', 'মা মা' 'মাসি মাসি' করে পালায়।

এখন আবার বাড়িতে দুটো দল গড়ে উঠল।

ভূত কি ভগবান এ প্রশ্ন এখন মুলতুবি আছে, বর্তমান প্রসঙ্গ বোঁচা। মানে যে বোঁচা বাড়ির মধ্যে সব থেকে হতমান্য, সব থেকে অ-দরকারি, সব থেকে গৌণ, আর প্রায় সকলের হিসেবে ওঁচা। যেমন চেহারা তেমনি বুদ্ধি, তেমনি আচার আচরণ। সেই বোঁচাকে নিয়েই এখন বাড়িতে যখন তখন অধিবেশন বসছে, আলোচ্য বিষয় বোঁচা, 'চোর' কি 'না-চোর'।

এই প্রশ্নে আগের দুই বিরোধী পক্ষ এক হয়ে গেছেন, শুধু 'স্বতন্ত্র'টি একা 'বিরোধী পক্ষে'। তাঁর মতে—"বোঁচাই চোর। নিশ্চয় চোর। নির্ঘাৎ চোর।"

আর সম্মিলিত বৃহৎ দলের মত—"হতেই পারে না বোঁচা চোর।"

—কী আশ্চর্য! দেখতে পাওনা সর্বদাই কেমন 'চোর-চোর' ভাব ওর?

—কী আশ্চর্য! বুঝতে পার না, বেচারা বানের জলে ভেসে আসা, কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে বলে অতো ভীতু ভীতু? কেন, বুবুনের সঙ্গে তো বেশ খেলে টেলে!

বড় দল একদিন বুবুনকে ধরলেন, "আচ্ছা বুবুন তোর কী মনে হয়? বোঁচাটা—"

বুবুন সতেজে বলল, "মনে হওয়া-হয়ির কী আছে? বলে দিচ্ছি—বোঁচা কখনো চোর নয়।"

একক পার্টি একদিন শুধোলেন, "বুবুন। তোমার কি মত? মানে বোঁচার ব্যাপারে?"

বুবুন রেগে বলে উঠল, "বাড়ির লোককে যদি 'চোর' বলতে ইচ্ছে হয় তোমার, ছোটকাকা, আমায় বল বরং!"

—বোঁচা বাড়ির লোক?

বুবুন ক্রুদ্ধ গলায় বলল, "বাড়ির লোক নয়? ও এখানে খায়না? শোয়না? থাকেনা? ওর আর কোনো বাড়ি আছে?"

অতএব বুবুনের কাছে খবর পাবার আশা নেই বোঝাই গেল।

ছোটকাকা বললেন, "ও বলবে? বোঁচা হল ওর হাতের পুতুল, খিদমদগার, সাকরেদ। বুবুনের কথায় বোঁচা ওঠে বসে। ঘুড়ি ওড়াতে বোঁচা, মার্বেল খেলতে বোঁচা, ইঁট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলতে বোঁচা, দেখছি তো রাতদিন। ওই সুযোগটি নিয়ে বোঁচা হাত সাফাই চালিয়ে যাচ্ছে তা বোঝবার বুদ্ধি বুবুন চন্দরের থাকলে তো?"

কিন্তু ও কথা তো ছোটকাকার।

বাকি সকলেই তো বোঁচার পক্ষের স্বেচ্ছাব্রতী উকিল। তাঁরা বলেই চলেছেন, "অসম্ভব। এই টিকটিকির মত কেলে শুঁটকো বোকার হাড্ডি বোঁচা! তার মাথায় এতো বুদ্ধি হবে?"

ছোটকাকা বললেন "বেশী চালাকরাই হাঁদা বোকা সাজে।"

—দূর, এতো দিন ধরে দেখা হচ্ছে—

ছোটকাকা মানে জ্ঞানেশ বর্মন জোরাল গলায় বললেন, "আচ্ছা এবার দেখতে পাবে। এখন ওয়াচ্ করে চলেছি। যেদিন হাতে নাতে ধরবো, সেদিন দেখবে—"

ওঁরা বললেন, "সেদিন আর আসছেনা বাপু, ভূত ভগবান, একজনকে তোমায় মানতেই হবে।"

—নেভার।

কিন্তু হায় প্রফেসর জ্ঞানেশ বর্মন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন, সেইদিনই তাঁকে মত বদলাতে হবে? হ্যাঁ সেইদিন দুপুরেই! কলেজে স্ট্রাইক চলছে, কলেজ বন্ধ, জ্ঞানেশ তাঁর স্টাডি রুমের ঘরের মধ্যে থাকতে থাকতে হঠাৎ অনুভব করলেন, ঘরটা বড় ঠাণ্ডা, একটু রোদে বেরোলে ভাল হয়। জানালা দিয়ে দেখলেন বাড়ির পিছনের খোলা জমিটায় বেশ রোদ। চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এসেই দেখেন বোঁচা সুট করে বাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে চোরের মত এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ওই জমিটা দিয়েই কোথায় যেন চলতে শুরু করল।

আর হ্যাঁ, যা ভেবেছেন তাই।

বোঁচার ময়লা ময়লা র‍্যাপার ঢাকা হাতটায় কী যেন একটা বড় সড় জিনিস! র‍্যাপারটা টেনে টেনে সেটাকে ঢাকবার চেষ্টা করছে!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত আহ্লাদে বিদ্যুৎ খেলে গেল জ্ঞানেশের। এই বার তো হাতে নাতে ধরা গেছে বাছাধনকে। আর কোথায় পালাবে যাদু?

চটপট এগিয়ে গেলেন।

পিছন থেকে নিঃশব্দে ওর চুলের মুঠিটা চেপে ধরে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

বলাই বাহুল্য এ অবস্থায় এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বোঁচা চুপ। বোঁচার কালো মুখটা শাদা হয়ে গেল, বোঁচার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল।

চুলের মুঠিধরা মাথাটা নাড়া দিয়ে জ্ঞানেশ ভীষণ গলায় আবার প্রশ্ন করলেন, "হাতে কী?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলনা বোঁচাকে। তার হাত পা বুক মাথা সব কেঁপে গিয়ে র‍্যাপারের আড়াল থেকে জিনিসটা রাস্তায় পড়ে গিয়েই জানিয়ে দিল জিনিসটা কী?

নাঃ টাকাকড়ি কাপড় চাদর চাল ডাল ছাতা জুতো এসব কিচ্ছু না, অতি দীনহীন তুচ্ছ একটা জিনিস। দড়িতে বাঁধা চারটি পুরনো খবরের কাগজ।

কিন্তু তাতে কী?

চুরি হচ্ছে চুরি। আলপিন চুরিও চুরি। বেশ বোঝা যাচ্ছে চুপি চুপি নিয়ে গিয়ে 'শিশিবোতল কাগজওলা'কে বিক্রী করে দেবে। আর এইভাবেই বাড়ির জিনিস-পত্র নিয়ে গিয়ে ওই কর্ম করে চলেছে।

ওঃ অসহ্য!

জ্ঞানেশ রাগে জ্ঞান হারিয়ে বলে ওঠেন, "চল তোকে পুলিশে দিইগে। পাজী বদমাস শয়তান বিচ্ছু। আচ্ছা, আগে চলো বাড়ির মধ্যে, আগে তোমার



...দড়িতে বাঁধা চারটি পুরনো খবরের কাগজ

স্বরূপ চেনাই সবাইকে।…'বোঁচা চোর হতেই পারে না। বোঁচা বোকাসোকা ভালমানুষ!'…দেখুন এবার সবাই, তোল কাগজগুলো তোল!"

ভয়ে-কাঠ বোঁচা কাঠের পুতুলের মতই নীরবে আদেশ পালন করে। জ্ঞানেশ তার কান ধরে টানতে টানতে বাড়ির মধ্যে নিয়ে এসে চীৎকার করে ওঠেন, "কই, কে কোথায় আছো? এসো দেখে যাও। বোঁচার স্বরূপ দেখে যাও।"

এ চীৎকারে দিবানিদ্রা ভেঙে বাড়ির সবাই ছুটে আসে।…ঠাকুমা ঠাকুরঘরের সামনের রোদভরা বারান্দা থেকে, বড় মেজ ছোট তিন বৌ নিজ নিজ ঘরের কম্বলের তলা থেকে, মোক্ষদা ছাদের ওপর থেকে, যোগীন্দর সিঁড়ির তলার চৌকী থেকে। শুধু বড়বাবু দ্বিজেশ বর্মন দোতলার দালানে পায়চারি করছিলেন, তিনি চটপট নেমে এলেন সব আগে। তিনি বিজ্‌নেসম্যান, বেলা ছুটোয় বাড়ি ফেরেন, আড়াইটেয় লাঞ্চ করেন, এইমাত্র সেটি সেরে, একটু হাঁটছিলেন। ওটাই স্বাস্থ্যবিধি।

বাড়ি নেই শুধু ছুটি মানুষ।

বুবুন, আর বুবুনের বাবা।

একজন স্কুলে, একজন অফিসে।

যাক, যারা আছে তারাই বা কম কি?

অনেক হৈচৈয়ের মধ্যে ঘটনাটি সকলেই জ্ঞাত হলেন এবং পাথর হয়ে গেলেন। যদিও বড়বাবু ছু একবার বলতে চেষ্টা করলেন, "সামান্য ছুখানা পুরনো খবরের কাগজ, তার জন্যে থানাপুলিশ—"

তাঁর যুক্তি টেঁকলনা।

জ্ঞানেশ দৃঢ়সংকল্প। বলেন—

"সামান্যর সূত্র থেকেই অসামান্যর সন্ধান মেলে। বোঝা যাচ্ছে ওর পিছনে কোনো গ্যাং আছে, তাদের প্ররোচনাতেই এই হতভাগা শয়তান তলে তলে সব সরাচ্ছে। আরো কত বাড়িতে কত জাল পাতা আছে কে জানে। পুলিশের মার খেলেই পেট থেকে কথা বেরোবে।" কী করলে কী হবে

কে জানে। আপাততঃ বোঁচার পেট থেকে তো দূরের কথা, মুখ থেকেও একটি শব্দ বার করা যাচ্ছেনা।

এমন কি এ অফারও করা হয়েছিল তাকে, "তুই একবার খুলে বল কার নির্দেশে এসব করছিস। বললে কম শাস্তি পাবি।"

কিন্তু বোঁচা বোবা।

সেই যে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে, নট নড়ন চড়ন, নট কিচ্ছু!

"সহজে হবেনা ছোটবাবু, মারই বোবার মুখ খোলানোর ওষুধ। আমার হাতে দিন ছেড়ে—"

বলে যোগীন্দর সিং তার বিরাট থাবার থাপ্পড় উঁচিয়ে এগিয়ে আসে, আর ঠিক এই সময় বইখাতা হাতে বুবুনের প্রবেশ ঘটে।

"এর মানে? কী হচ্ছে এখানে?"

হুইশ্লের মত চেঁচিয়ে ওঠে বুবুন।

সবাই চমকে ওঠে তার আর্তনাদে।

শুধু জ্ঞানেশ নির্বিকার, "কিছু হচ্ছেনা। শুধু এই সাধু, সন্ত, মহাপুরুষ মহারাজকে থানায় জমা দিতে যাওয়ার আগে একটু ধোলাই দিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

"যোগীন্দরদা, খবরদার।"

আরো চেঁচিয়ে ওঠে বুবুন, "খবরদার মারবেনা ওকে, কী করেছে ও?"

জ্ঞানেশ আরো ব্যঙ্গের গলায় বলেন, "বিশেষ কিছু না, শুধু বাড়ি ফাঁকা করে ফেলবার তাল করে চলেছেন। তবে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হঠাৎ এই কাগজের সূত্রে হাতেনাতে ধরা পড়লেন চাঁদু। ··· ভূত, ভগবান এখন দেখলে তো সবাই। এখন চলুন মহারাজ শ্রীঘরে—"

—না।

বুবুন ছিটকে সরে এসে বোঁচার পাশে দাঁড়িয়ে বীরবিক্রমে বলে, "বোঁচা যাবেনা, আমি যাবো।"

—তুই যাবি? কোথায় যাবি?

—কেন, জেলখানায়। বোঁচার কী দোষ? ওকে তো আমিই বলে

গিয়েছিলাম, কাগজগুলো দীনুর মা বুড়িকে দিয়ে আসতে। ও বেচারী ঠোঙা বানিয়ে পয়সা পায়।

—দীনুর মা কে?

—সকলের একযোগে প্রশ্ন।

—কে আবার? মানুষ! গরীব মানুষ! বোঁচাদের গ্রামের বানে ওদের পাড়াটা সব ভেসে যায়নি? তারা সবাই এখান সেখান ঘুরে ওই গঙ্গার ধারের মাঠে পাতার কুটির বানিয়ে বাস করছেনা? ওদের কিছু আছে? জামা কাপড় চাদর বিছানা বাসনপত্তর হ্যানো-ত্যানো? সে সব চাইনা ওদের?

—অ্যাঃ। ওঃ! তাই!

সকলের মুখই হাঁ হয়ে আর বোজেনা।

জ্ঞানেশ কাছেই একটা টুলে বসে পড়ে বলেন, "তারমানে তুমিই নাটের গুরু? ওদের যা যা সব চাই তুমি তা যোগান দিয়ে আসছ এতোদিন?

বুবুন দৃঢ় গলায় বলে, "না দিলে? ওরা বুঝি না খেয়ে মরবে?"

ঠাকুমা এখন বলে ওঠেন, "তা বলে কয়ে চেয়ে নিলেই পারতিস।"

—আহা! বললে তোমরা দিতে যে!

বুবুন বিদ্রূপের গলায় বলে, "ভারী দাতা যে! ভিখিরিকে একটা কাপড় দিতে হলে বেছে বেছে ছেঁড়াটা দাও দেখি না যেন!"

জ্যাঠামশাই আস্তে বলেন, "তা চালডাল দিয়েছিস দিয়েছিস, এতো সব কেন? এতো জিনিস লাগে ওদের?"

বুবুন গম্ভীরভাবে বলে, "তোমাদের কত জিনিস লাগে তা ভেবে দেখেছ? তোমরা তো মোটে এই কজন আর ওরা? পঁচিশ তিরিশ জন! এটুকুও লাগবে না? মেয়েরাই তো শুধু কাপড় পরতে পেরেছে, ব্যাটাছেলেরা তো বিছানার চাদর ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো করে পরেছে! আর তোমাদের? এক একজনের একশো দুশো—আমারই তো কত গাদা গাদা শার্ট প্যাণ্ট ছিল—"

বুবুনের মা ঝাঁপিয়ে উঠে বলেন, "সে সব দিয়ে দিয়েছিস নাকি?"

—সব দেবার উপায় আছে? তুমি ধরে ফেলবে না?

বুবুন বলে, "বেশী ভালগুলো তো সবই রেখে দিয়েছি। একজনের পঞ্চাশটা, আর পঞ্চাশজনের একটাও নেই, মানে হয় এর? এই তো জ্যাঠামণি, তুমি যে—'যদি যুদ্ধু লাগে, তখন খেতে পাবো না' বলে এতো এতো জিনিস কিনে কিনে পচাচ্ছ, আর ওরা? এখনই খেতে পাচ্ছে না।"

—ওঃ দয়ার সাগর মহাপ্রাণ! পুণ্যাত্মা মহাশয়!

ছোটকাকা ঠাট্টার গলায় বলেন, "কিন্তু চুরির মাল দাতব্য করলে কি আর পুণ্য হয় হে?"

—চুরির মাল!

বুবুনের মুখটা আগুনের মত হয়ে ওঠে, "বাড়ির জিনিস নিলে চুরি করা হয়?"

—তা বাপু দ্বিতীয় ভাগে তো লেখা আছে, 'না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়।'

বুবুন একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলে, "ওঃ! তোমরা সবাই আমার পর? ঠিক আছে—তাহলে আমায় থানায় নিয়ে চল। শীগগির চল। কিন্তু কক্ষনো বোঁচাকে নয়। ও রোজ ভয় পেয়েছে, আমিই জোর করে করে! এই বুদ্ধু, বোবার মতন চুপ করে বকুনি পিটুনী খেয়ে যাচ্ছিস যে? বলতে পারছিস না, তোর দোষ নেই ছোড়দাবাবু বলেছে তাই করেছিস।··· বোকারাম হাঁদা। যা, তোর সেই চেনা লোকেদের কাছে চলে যা, পাতার কুঁড়েতে থাকগে যা। এই পচা বাড়িতে থাকতে হবে না।···ছোটকাকা চলো শীগগির। আমি চুরি করেছি, আমি জেলে যাব, বাস। পুলিশকে বলবে চলো—এই ছেলেটা পরের জিনিস চুরি করে ছাত থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রান্নাঘরের পেছনের বাগানে নামিয়ে দিয়ে—"

—কী? কী বললি? ছাত থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে বাগানে নামিয়ে দিয়ে দিয়ে?

—তা কী করবো? তোমাদের সামনে দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবো? বাজে কথা থাক ছোটকা, শীগগির আমায় পুলিশে দেবে চলো। চোরকে বাড়িতে রাখবে কেন?

—থাম থাম, যথেষ্ট ভূতোমি হয়েছে, ওঃ!···প্রফেসর জ্ঞানেশ হঠাৎ টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সারেণ্ডারের ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে বলে ওঠেন, "নাঃ, তোমাদের কথাই মানছি! ভূতের কাণ্ডকারখানাই চলেছে বাড়িতে। মানুষের মাথায় আসতো এসব? তা জানতাম না তো বাড়ির মধ্যে জলজ্যান্ত একটি ভূত তৈরী হয়ে বসে আছে। বলে কি না ছাত থেকে দড়ি বেঁধে—অ্যাঁ। ভাবতে পারো বড়দা? শুধু ভূত নয়, এটি হচ্ছে একখানি জিনিয়াস ভূত!"

জ্যাঠামশাই আস্তে এগিয়ে আসেন বোঁচার দিকে। ওর মাথায় একটি হাত রেখে বলেন, "বাড়িতে শুধু একটি ভূতই নেই গেনু, একটি ভগবানও আছে, এতো লাঞ্ছনাতেও একবার বলে উঠল না—'আমার কী দোষ? ছোড়দাদাবাবু বলেছে বলেই তো'—একে ভগবান বলব না?"

ফাল্তুরাও ফেল্না নয়

ছোটদের খাইয়ে তুলে দেওয়ার পর বরযাত্রীদের ব্যাচ্টাই শুধু উদ্ধার হয়েছে, জায়গার অভাবে কন্যাযাত্রীদের প্রায় সবাই বাকি। ছাতে মাটি ঢেলে খানিকটা বাগান করার জন্যে জায়গা কমে গেছে, কটাই বা টেবিল পাতা সম্ভব হয়েছে ?

এখন ওইগুলো সাফ হলে তবে 'বসে-থাকা'দের ডাকা হবে। যতজনকে পারা যায় একসঙ্গে—

এই পর্যন্ত শুনেছেন কনের বাবা ঘটেশ্বর। হঠাৎ ভাগ্নে ভগ্নদূতের মত এসে খবর দিল, "মামা! মাংস খতম!"

—মাংস খতম!

ঘটেশ্বর সবেমাত্র সম্প্রদান সেরে গরদের ধুতি বদলে কোঁচানো কাঁচি ধুতি পরতে যাচ্ছিলেন, এ হেন সময় এই প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ।

"মাংস খতম! অ্যাঁ—অ্যাঁ! কী বললি ভ্যাবলা? খতম মানে?"

—খতম মানে খতম। নেই। ডেক্চির তলায় শুধু একটু ঝোল পড়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘটেশ্বর আরো ব্যাকুল হয়ে বললেন, "এতো মাল গেল কোথায়?"

—কোথায় আর! বরযাত্রীদের পেটে। দারুণ সেঁটেছে। যতবার ঘুরি একবারও 'না' বলেনা। বরং বলে, বালতিটা এদিকে আনুন তো?

—তা একটু হাত রেখে দিবি তো?

—বাঃ! আগেই বলে দিয়েছিলেন বরযাত্রীদের যা দিবি দরাজ হাতে দিবি।

—তা বলে, দুশো লোকের মাংস, একশো জনে খাবে?

ভ্যাবলা তাড়াতাড়ি বলে, "লোকের মাংস নয় মামা, মাংসটা পাঁঠার।"

—থাম ভ্যাবলা রাগ বাড়াসনি। এখন উপায়? আমার যে চেঁচাতে ইচ্ছে করছে। 'মাংস-খতম' না বলে 'মামা-খতম' বললি না কেন? তাও ভাল ছিল।

ভ্যাবলা নিজের মুখেই হাত চাপা দিয়ে বলে, "মামা চুপ চুপ। রব তুলোনা। যাদের পেটের মধ্যে এখন আগুন জ্বলছে, তাদের কানে একথা পৌঁছলে ইঁট ছুঁড়বে।"

—ইঁট ছুঁড়বে?

ঘটেশ্বর বসে পড়েছিলেন, উঠে পড়ে বারণ ভুলে চেঁচিয়েই উঠলেন, "তারা ইঁট ছুঁড়বে?"

—ছুঁড়বে না? কখন থেকে হাঁ করে বসে আছে আর শুনছে 'এই এক্ষুনি' অথচ ঘন্টা দুই ধরে ফ্রাই ভাজার গন্ধ পাচ্ছে। তারা এখন একথা শুনলে ইঁট ছুঁড়বে না তো কি হরিনাম করবে?

ঘটেশ্বর কাঁদো কাঁদো হয়ে বললেন, "তবে যে তখন শুনলাম বরযাত্রীদের ঝামেলা মিটে গেছে।"

—সে তো গেছেই। তাতে কী?

—কন্যেপক্ষের লোক কনের বাবার বিপদ বুঝবে না?

—বাঃ মামা বেশ! কন্যেপক্ষ বলে তারা মহর্ষি হবে? আমার তো ভাবনা হচ্ছে হাতের কাছে ইঁট না পেলে চেয়ার টেবিল ছুঁড়বে। নেমন্তন্ন খেতে এসে মাংস খতম শুনলে রক্তমাংসের মানুষ স্থির থাকতে পারে?

—ভ্যাবলা রে,—এক কাজ কর। আমি এখানে ফেন্ট্ হয়ে পড়ি; তুই বাড়িতে কান্নাকাটি তুলে দে।

—আঃ ইস! বাজে কথা রাখো মামা। মেয়ের বিয়ের রাত্তিরে 'বাড়িতে কান্নাকাটি তোল'! খুকুটা বাসর ঘর থেকে উঠে এসে চেঁচাক, খুব ভালো!...এখন একমাত্র উপায় গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে হোটেল রেস্টুরেণ্টে ঘুরে ঘুরে শতখানেক লোকের মাংস কালেকশান করে এনে—

৬



মামা ভাগ্নে তাকিয়ে দেখল, পাড়ার সেই অগাবগা ভুতোটা

—ভ্যাবলা! লোকের মাংসই? তুই যে তখন বললি মাংসটা পাঁঠার—

—আঃ মামা! সিরিয়াস হও। পাঁঠা ভেড়া মুরগী হাঁস—মানুষ বাদে এনিথিং জোগাড় করে ফেলে চালিয়ে দিতে হবে। এখন টাকা ছাড়ো—

—তা তো ছাড়ছি! কিন্তু কখন ফিরবি বাপ? এখন রাত ক'টা?

ভ্যাবলার যদিও গায়ে গেঞ্জি, কোমরে ঝুলন্ত তোয়ালে আর তাতে মাংসর ঝোলের ছাপ, তবু হাতে ঘড়িটি বাঁধা আছে ঠিকই। হাত উল্টে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে পৌনে ন'টা—

আর বলতে না বলতে কে বলে ওঠে, "কে বললে পৌনে ন'টা? না-না পৌনে আটটা তো।"

—পৌনে আটটা! ইয়ার্কি নাকি! সাড়ে সাতটায় শেষ ব্যাচ্ বসানো হয়েছিল। তারা খেয়ে দেয়ে চলে গেল, বললো কে কথাটা?

মামা ভাগ্নে তাকিয়ে দেখল, পাড়ার সেই অগাবগা ভূতোটা। দু চক্ষের বিষ ঘটেশ্বরের এই রাবিশ মস্তানটা।

ওর পণ্ডিত ঠাকুর্দা একদা আদর করে নাম রেখেছিলেন 'ভবভূতি', তার ফলাফল এই—বাবা ডাকে ভবা, মা ডাকে ভূতো আর বাকি লোকেরা যখন যেটা সুবিধে বোঝে।

পণ্ডিত ঠাকুর্দার নাতি ভবভূতি স্কুলের গণ্ডিটাও পার হতে পেরে ওঠেনি, ক্লাশ এইট-এর পর থেকেই ডিগবাজি খেতে খেতে বছর কয়েক কাটিয়ে ইস্তফা দিয়ে রকের আড্ডায় নাম লিখিয়ে কিছুকাল কাটিয়ে এখন নাকি কী সব করে বেড়ায়।

কেউ বলে যোগ-ব্যায়াম শেখায়, কেউ বলে ভোজবাজি শেখায়, কেউ বলে পাড়া গার্ড দেয়। এ ছেলেকে কোন্ ভদ্রলোক ভালবাসতে যাবে? ঘটেশ্বর তো একজন ভদ্রলোক না কি?

অথচ ওটা এমন মান-মর্যাদাহীন, না ডাকলেও এসে হাজির! সেই সেবার ঘটেশ্বরের জ্যাঠামশাই মহেশ্বর রায় সিঁড়িতে পড়ে পা ভাঙলেন। কেউ ডাকেনি, তবু ভবা যে কেমন করে নিজের একটা মজবুৎ পোস্ট ক্রিয়েট

করে ফেলল কে জানে! দেখা গেল, ভবাই রোজ দুবেলা হাসপাতালে খাবার নিয়ে যাচ্ছে, ভবা-ই বুড়ো বাড়ি ফেরার পর রোজ সকালে এসে মাসাজ্ করে দিচ্ছে, আর ভবা-ই ডাক্তারখানায় যাওয়া আসার কাজটা 'নিজের চাকরী' বলে ঘাড়ে নিয়ে বসে আছে।

শুধু ঘটেশ্বরের বাড়ি বলেই নয়, পাড়ার সব বাড়িতেই ভবার গতিবিধি। যারা 'ভূতো' বলে, তাদের বাড়িতেও। এই যে সেদিন বন্যার সময় কলকাতার রাস্তা ছাপাল, শহরসুদ্ধু লোক জলের মধ্যে বসেও খাবার জলের অভাবে 'হা জল' 'হা জল' করলো, তখন ভূতোই তার চেলা-চামুণ্ডাদের নিয়ে পাড়ায় বাড়ি বাড়ি কোথা থেকে না কোথা থেকে খাবার জল এনে এনে সাপ্লাই করলো।

গলা অবধি জল, তাই খাবার জলের ড্রাম্ মাথার উপর তুলে নিয়ে এসেছে।

ঘটেশ্বরদেরও করেছে। করবেই। পরোপকার না করে ছাড়বেনা।

এই তো মেয়ের বিয়েতে ওকে নেমন্তন্ন তো দূরের কথা, 'কাজ করে দিস বাবা' বলেও ডাকেন নি ঘটেশ্বররা তবু ভূতো বা ভবা তিনদিন আগে থেকে এ বাড়ির মাটি নিয়ে বসে আছে। যেখানে হিজিবিজি সেখানেই ভবা অর্থাৎ (সামনা সামনি) 'ভব'। এখনও ভবার গায়েও গেঞ্জি, কোমরে ঝুলন্ত তোয়ালে, হলুদ রঙ, ঝোলে চিত্র-বিচিত্র। হাঁস-ফাঁস করে খাটছে তখন থেকে।

তবু ওকে দেখেই হাড় জ্বলে গেল ঘটেশ্বর রায়ের যেমন সবসময় যায়। একে তো মুখ্যুই অসহ্য ঘটেশ্বরের, তায় আবার মুরুব্বি-মার্কা কথা। এই 'কথাই' হয়েছে কাল ভবভূতির। নয়তো নিজের কব্জিতে ঘড়ির বালাই না থাকা সত্ত্বেও যার কব্জিতে বাঁধা রয়েছে, তাকে বোঝাতে আসে ক'টা বেজেছে!

ভ্যাবলা বিরক্ত হয়ে বলে উঠল "পৌনে আটটা! সেটা আবার কাল সকালে বাজবে—"

বলেই বলে উঠল, "আরে! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে বসে আছে দেখছি। …মামা দেখোতো তোমারটা—"

ঘটেশ্বর আলমারির মাথায় বসানো টাইমপীসটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী হল? পৌনে আটটাই তো দেখছি—"

—দম দিয়েছিলে?

—আমি তো দিইনা, রাজু দেয়!

—আরে বাবা, তোমার হাতঘড়িটা?

—সেটা? সেটা তো চামড়ার ব্যাণ্ড বলে ওই পূজোটুজোর সময় ঠাকুরমশাই অবজেকশান তোলায় তোর মামীর হাতে—

—ঠিক আছে! দালানের বড় দেয়ালঘড়িটা দেখে আসছি,—

—ভ্যাবলাদা, বেশী দেরী করলে কিন্তু হোটেল রেস্টুরেণ্টও ফর্সা হয়ে যাবে।

—আঃ! আবার সর্দারি!

ঘটেশ্বর দাঁত কিড়মিড় করেন।

ভ্যাবলা এসে বলল, "ওটাতেও তো সাতটা আটচল্লিশ দেখলাম! তার মানে আমরা তখন থেকেই তাহলে একবার ঘড়ি ভুল দেখে—"

—ভ্যাবলা। তাহলে আর এতো অস্থির হবার কিছু নেই। বাজার থেকে কাঁচা মাংস কিনে এনে রাঁধুনী ঠাকুরদের বল্ চটপট রেঁধে ফেলতে। পরামর্শ দিলেন ঘটেশ্বর।

কিন্তু মাতব্বর ভব বলে ওঠে, "ভ্যাবলাদা ও রিস্‌কে যাবেন না। বরং যেসব রেস্টুরেণ্টে ফ্রীজ আছে সেখানে চলে যান, ওদের ঘরেই বেশী মজুৎ থাকে। গোলপার্কের 'নব দিগন্ত'-এ ফ্রীজ আছে, গড়িয়াহাট বাজারের ওধারে 'কল্পনা কেবিনে'-এ আছে, রাসবিহারীতে 'শোভায়' আছে। অবশ্য ফ্রীজ আজকাল অনেকেই রাখছে। চটপট চলে যান কিন্তু ভ্যাবলাদা! আমি ততক্ষণ এদিকটা ম্যানেজ করছি।"

তুমি আর কী দিয়ে ম্যানেজ করবে চাঁদু—

ভ্যাবলা ছুটে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে যায়, "আসল ডেকচিটাইতো ঢং ঢং। শুধু ফ্রাই আর ফ্রায়েড রাইসে কেউ ভুলবে না।"

আর ঘটেশ্বর রাগ-চাপা গলায় বলে ওঠেন, "এই বয়েসে এতো সবজান্তা হলে কী করে হে ভবভূতিবাবু? শহরের তাবৎ রেস্টুরেণ্টের ঠিকানা তোমার জানা?"

—না জানলে চলে না মেসোমশাই। কত সময় কত দরকারে—এই সেরেছে, ছাতে হল্লা উঠেছে মনে হচ্ছে!

ভবভূতি ছুটে ছাতে উঠে যায়।

সত্যিই হল্লা উঠেছে।

ঘটেশ্বরও পিছু পিছু উঠে যান হাত ঘড়িটাকে জম্পেস করে হাতে বেঁধে। হল্লা কিসের! মাত্র সাতটা পঞ্চান্নয় এতো হল্লা কিসের? দেখে নেবেন সবাইকে। কন্যেপক্ষ না?

ছাতে উঠে এসে শুনতে পান 'এখনো টেবিল পড়েনি? ব্যাপারটা কী? বলে দিলেই হতো বরযাত্রীদের ছাড়া আর কাউকে খাওয়ানো হবে না' ইত্যাদি বলে সব চেঁচাচ্ছে।

ভব মিষ্টিমধুর গলায় তাদের বলছে, "একথা বলছেন কেন দাদু? এই তো মাত্র আটটা বাজছে—"

—কী আটটা বাজছে? তামাসার আর জায়গা পাওনি ছোকরা? আমি কে তা' জানো? ঘটেশ্বরের বড় মামা আমি। নিজের মামা।

অবশ্য ঘটেশ্বরেরই সব। বহু রকমের মামা, কাকা, পিসে, মেসো, শালা, শ্বশুর তুতো-শ্বশুর, আর নানারকমের ভাইপো ভাগ্নে শালাপো শালীপো ইত্যাদি। ইংরিজিতে যাদের এককথায় 'নেফিউ' বলে সেরে দেওয়া যায়। বন্ধুও আছে কিছু, কিন্তু আপাতত তাদের মেজাজ বন্ধুভাবাপন্ন নয়।

সকলেই তো বরযাত্রীরা পান চিবোতে চিবোতে চলে যাবার পরও ডাক না পড়ায় রেগে লাল হয়ে নিজেরাই হুড়মুড়িয়ে ছাতে উঠে এসেছে।

এখন সকলেই "মাত্র আটটা বাজছে"—শুনে 'এই মার সেই মার' করে ভব'র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গিয়ে থমকে যায়—"আরে! ঘড়িটায় কী

দম দিইনি আজ ?”…“ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে বসে আছে কখন ?”…মানে ! এই তখন দেখলাম ইয়ে—”

একজন বলে উঠল, “ব্যাপার কী ? ম্যাজিক নাকি ? ঘণ্টাখানেক আগে দেখেছি পৌনে--”

এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ভবভূতি ঝপ করে কোমরে ঝোলানো তোয়ালেটা টান মেরে হাতে নিয়ে শূন্যে ঝাপট মারতে মারতে বলে ওঠে, “আপনাদের হাতেবাঁধা নিজের নিজের ঘড়ি—আপনাদের আর কী ম্যাজিক দেখাবে স্যর ? ম্যাজিক বরং এর কাছে দেখুন।”

বলার সঙ্গে সঙ্গেই তোয়ালের ঝাপট থেকে ঝপঝপ ঝরে পড়ে একরাশ টফি !…প্রায় হরির লুঠের মত !

ঘটেশ্বরের পিছন পিছন ঘটেশ্বর গিন্নীও উঠে এসেছিলেন ঘটেশ্বরকে সরবৎ আর সন্দেশ খাওয়াতে। তাঁর ডিপার্টমেন্ট ওই পর্যন্ত। মাংস-ঘটিত মর্মান্তিক খবর তাঁর অজানা। তাই বেজার গলায় বলে ওঠেন, “এ আবার কী আহ্লাদেপনা ভূতোর ! রাত হয়েছে লোকে খেয়েদেয়ে বাড়ি যেতে পারলে বাঁচে, এখন কিনা ম্যাজিকের বাজার খুলে বসলো ! বিদ্যে দেখাবার আর সময় পেল না ?”

ঘটেশ্বর মুখে চাবি দেওয়ার ভঙ্গীতে গিন্নীকে থামিয়ে চুপি চুপি বলেন, “ভবা ম্যাজিক জানে বুঝি ?”

—জানে না ? ওই করেই তো বেড়ায় ! তা'বলে এখন ?

ঘটেশ্বর বলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ এখন। এই হচ্ছে বেস্ট সময়। আরও জানে ?

—জানে তো ! তাসের ম্যাজিক ট্যাজিক কত দেখায়।

—দেখায় ?

ঘটেশ্বর বলেন, “ছুটে চলে যাও। যত জোড়া পারো তাস জোগাড় করে নিয়ে এসো।”

—তোমার আবার একী খোকামি ?

—আঃ ! যা বলছি শোনো না ! জীবনমরণ সমস্যা চলছে এখন।

ওদিকে ভবভূতি তোয়ালে ঝাপটাচ্ছে আর বলে চলেছে, "তুলে নিন, তুলে নিন! দাদুরা, মেশোমশাইরা, কাকুরা, পিসেরা, দাদাভাইরা। বর্ষণটা ঐন্দ্রজালিক হলেও জিনিসগুলো জাল নয়, ভেজাল নয়। নির্ভয়ে খান।"

আর জাল ভেজাল!

জ্বলন্ত পেটের সামনে জলজ্যান্ত টফি!

ভয়ে কি নির্ভয়ে কে জানে, টপাটপ তুলে নিতে থাকে সবাই, আর মোড়ক খুলে খুলে গালে ফেলেও সবাই। বুড়ো হাবড়ারা পর্যন্ত!

আহা! টফি যে এমন অমৃত আগে কে জানত?

ইত্যবসরে ঘটেশ্বর দু'জোড়া তাস হাতে নিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "আরে ভবভূতি, তুমি নাকি খুব ভালো তাসের ম্যাজিক জানো? তোমার মাসিমা বলছিলেন—"

তাসের ম্যাজিক!

ব্যস! ক্ষিদে টিদে সব ডানা মেলে উড়ে যায়, সক্কলে সেই শাদা কাগজ পাতা খাবার টেবিলের ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

—তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে হয়ে যাক দু'একটা!

ভব তাস দু'জোড়া ভাঁজতে ভাঁজতে আর কায়দা করে ছড়াতে ছড়াতে বলল, "এখন আবার এসব? আপনাদের দেরী হয়ে যাবে না?

—আরে এখনো তো পাত পড়েনি। আসুক না। ততক্ষণ বরং তোমার ম্যাজিকটাই দেখা যাক।

—বলছেন? আচ্ছা—

ভবভূতি একজোড়া তাস কায়দা করতে করতে একটু লাজুক লাজুক হেসে বললো, "আমার আবার একটা দোষ আছে। দেখাতে দেখাতে নেশা লেগে যায়—সময়ের জ্ঞান থাকে না।"

—আরে বাবা লাগুক না! আমরা তো সজ্ঞানে থাকবো। পাত পড়লেই তোমার নেশা ছাড়িয়ে দেব।



...আমার আবার একটা দোষ আছে। দেখাতে দেখাতে নেশা লেগে যায়—

ভব বা ভূতো দু'জোড়া তাস এক করে ফেলে অবাক গলায় বলে উঠলো, "আচ্ছা মেসোমশাই, এ তাস কি আপনি এক্ষুনি কিনে আনালেন?"

—কিনে আনালাম?

ঘটেশ্বর তাচ্ছিল্যের গলায় বলেন, "ধ্যেৎ! কিনে আনাবো কখন? এ তোমার মাসিমা সাপ্লাই করলেন। দেখছ না রং-চটা পুরনো।"

ভব 'বিস্ময়-বিমূঢ়'ভাবে বলে, "তাতো দেখছি। কিন্তু ব্যাপার বুঝতে পারছি না তো।"

—কেন হ'লটা কি?

ঘটেশ্বর অসহিষ্ণু!

কেউ কেউ অস্ফুটে মন্তব্য করে ওঠে, "এ তাসে আর হতে হয়না। নিজের বানানো কৌশল-করা তাস তো নয়!"

ততক্ষণে ভব দু'জোড়া তাসের বাহান্ন বাহান্ন একশো-চারখানা তাস

৭

দশ জনের খাবার মাপের টানা লম্বা টেবিলে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বলে, "দেখুন ব্যাপার! সব তাসগুলো শুধু লাল সাহেব।"

সত্যিই দেখা গেল টেবিল ভরে শুধু হরতনের সাহেব! সারি সারি পাশাপাশি, ঘাড়ে ঘাড়ে।

—আরে আরে এর মানে?……ও হো হো! ম্যাজিক!

হাততালির শব্দে পাশের বাড়ির লোকেরা চমকে উঠল। বিয়ে বাড়ির ছাতে কি ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে?

—ও ভাই আর একটা, আর একটা। কী তোমার নাম যেন?

ভব কিছু বলার আগেই ঘটেশ্বর তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "ভবভূতি। ভবভূতি সোম।…

—ওর বাবার নাম শুভমতি রায় জানেন তো!

দর্শকদের তুমুল আবেদনে ভব আবার তাস দু'জোড়া গুছিয়ে ফেলে, ভাঁজিয়ে নিয়ে দেখেই অমায়িকভাবে বলে ওঠে, "না তো মেসোমশাই, আমারই ভুল হয়েছিল, তাস ঠিকই আছে। এই তো—"

দেখা গেল সব তাসই ঠিক-ঠাক আছে।

কিন্তু এখন আবার তাসদের পিঠগুলো বদলে গেল যে!

একজোড়া তাসের পিঠে ছিল শুধু ফুলের নক্সা, আর একজোড়ার ছিল একটা এরোপ্লেনের ছবি। এখন দেখা গেল, একশো-চারখানা অশোক কুমারের মুখ।

আবার হর্ষধ্বনি।

আবার হাততালি।

আবার সাদর অনুরোধ।

—আর একখানা ছাড়ুন ভাই। আর একখানা। ইস! শিখেছ বটে। তাজ্জব করে দিলে।

এতো অনুরোধ উপরোধ কে ঠেলতে পারে? অতএব ভবভূতিকে আরো ম্যাজিক দেখিয়ে চলতে হয়… একটির পর একটি।

যে যে-তাসটা মনেমনে মনে করেছে, সেটা তার পকেটে চালান করে দেওয়া, একসঙ্গে ষোলজনের মনে-মনে-ভাবা তাসের নাম বলে দেওয়া, ঘটেশ্বরের বড় মামা, বলবার সময় চালাকি খেলে "না-না ওটা নয়" বলায়, তার কোঁচার ভাঁজ থেকে যে-তাসটা ভেবেছিলেন সেইটাই বার করে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি লোমহর্ষক সব খেলা দেখিয়ে চলে ভবভূতি এবং মাঝে মাঝে সিঁড়ির দিকে তাকায়।

তাকাতে তাকাতে চোখে পড়েছে ভ্যাবলা এসে ইসারা করে গেছে, কিন্তু এঁরা যে ছাড়তে চাইছেন না!

অগত্যাই আর এক চমকপ্রদ খেলা দেখিয়ে খেলা শেষ করে ফেলতে হয় ভবভূতিকে।··· দু'জোড়া তাস হাত উঁচু করে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। অনেকের গায়েই ঝরে ঝরে পড়ে, কিন্তু একখানাও কুড়িয়ে পাওয়া যায় না।

সেই একশো-চারখানা তাস সম্পূর্ণ হাওয়া!

অথচ মাথায় প্যাণ্ডেল, উড়ে পালাবার কোনো পথ নেই।

প্রত্যেকেই হেঁট হয়ে নিজের নিজের পায়ের কাছে খুঁজতে চেষ্টা করে। কারণ নিজের চক্ষে দেখেছে গা বেয়ে মাটিতে পড়ল। কিন্তু আধখানা তাসও খুঁজে পাওয়া গেল না। না ফুল-মার্কা, না এরোপ্লেন-মার্কা, না তো অশোককুমার-মার্কা।···

—বৃথা চেষ্টা দাদু।

ভবভূতি আবার তোয়ালেখানার কোণ দুটো কোমরে আঁটতে আঁটতে বলে ওঠে, "খুঁজে পাবেন না। অনেকক্ষণ খেটেছে, তারা এখন বাসায় চলে গেছে টিফিন করতে। নিন—আপনারাও বসে পড়ুন।" মাথা তুলে দেখতে পেল—সবাইকার টেবিলে পাত পড়ে গেছে।

পাশে পাশে বড় বড় ডিশ।

ছাগল ভেড়া এবং মুরগী এই ত্রিশক্তি সম্মেলনে কারির ওজনটা হয়ে গিয়েছিল বেহিসেবী রকম বেশী। নার্ভাস ভ্যাবলা গাড়িতে একটা ড্রাম বসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, আর যত যেখানে যাচ্ছিল, বলছিল, চটপট যতটা পারেন দিয়ে দিন।

—ভোরবেলা পিকনিকে যাবেন বুঝি ?

—ওই সেই রকমই আর কি ! তাড়াতাড়ি করবেন ভাই।

এখন খাওয়াতে বসিয়ে অনুরোধ উপরোধ করতে হচ্ছে—"আর একটু নিন, আর একটু নিন ।···'আর না, আর না' করছেন কেন ? রান্না ভাল হয়নি বুঝি ?"

—ভাল হয়নি কি ! এরকম টেস্টফুল মাংসর কারি সহজে খেতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুত একটা অন্য ধরনের স্বাদ। এও তোমার ম্যাজিক নাকি ? বোঝা যাচ্ছে না কিসের, অথচ—

—না না, কী যে বলেন ! তবে আরও একটু নিতেই হবে।

এই অনুরোধ-উপরোধের প্রধান কর্তা অতি বাক্যবাগীশ ভবা। কিন্তু এখন আর ঘটেশ্বর তার কথায় বেজার হচ্ছেন না। ভ্যাবলাটা বোকার মত এতো এনেছে, ওগুলো পাচার করতে হবে তো !

"খুব ভালো খেলাম ঘটেশ্বর তোমার মেয়ের বিয়েয়।···এখন চলি। এ কী ! সাড়ে এগারটা বেজে গেছে ? সর্বনাশ ! কখন বাজলো এতোটা ? বাস পাবো তো ?"

সবজান্তা চটপট বলে ওঠে, "হ্যাঁ হ্যাঁ পাবেন বৈ কি ! এ রাস্তায় রাত বারোটা অবধি বাস চলে।"

ওরা হুড়মুড়িয়ে চলে যেতে ঘটেশ্বর খপ করে ভবার হাতটা চেপে ধরে বলে ওঠেন, "তুমি আজ আমায় ইঁট খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ ভবভূতি ! কী বলে যে তোমায় আশীর্বাদ করবো ! এমন সব তাজ্জব তাজ্জব খেলা শিখলে কোথায় ?

—কিছুনা কিছুনা মেসোমশাই, স্রেফ হাত সাফাইয়ের ব্যাপার। অভ্যাস করতে করতে—অবিশ্যি কিছুটা ইন্দ্রজাল থাকে !

—তাসগুলো উড়ে যাওয়া ?

ভবভূতি একটু হাসল, "ওটা ইন্দ্রজাল। শিখতে হয়েছিল রাস্তার একটা বেদের কাছে, রোজ ধর্ণা দিয়ে দিয়ে। দেখতাম, চোখের সামনে জিনিস অদৃশ্য করে দিচ্ছে। অথচ নেহাৎ ভিখিরির মত দেখতে একটা বুড়ি।"



...তুমি আজ আমায় ইঁট খাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ...

ভবভূতির সর্বাঙ্গে তরকারির ঝোল, ঘাড়ে গলায় কপালে গায়ে ঘাম, তবু তার মুখে চোখে আহ্লাদ—"আর আমার বেস্ট খেলাটা শিখেছিলাম এক পাগলা সাহেবের কাছে। সেও প্রায় পথ-ভিখিরির মত। আসলে ফাল্‌তুরাও ফেল্‌না নয় মেসোমশাই!"

ভ্যাবলা বলল, "আমি অনেক কিছুই দেখিনি। মামা বেস্ট খেলাটা কী রকম?"

ভবভূতি ঝোলানো তোয়ালে দিয়েই ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলে, "সেটা আপনি দেখে গেছেন ভ্যাবলাদা—"

—আমি? আমি থাকতে থাকতে কখন আবার তুমি ম্যাজিকের খেলা দেখালে ভব?

—কেন? ওই যে ঘড়ির খেলা? যেখানে যার যত ঘড়ি সব এক ঘণ্টার মত সময় পিছু হাঁটিয়ে দিলাম!

—মামা! অ্যাঁ—অ্যাঁ!

—ভ্যাবলা! অ্যাঁ-অ্যাঁ।

—ভব!

—ভূতো!

—না না, বাবা ভবভূতি!

তুষার-যুগ এলো বলে

গিয়ে কেউ কখনো দেখে আসেনি, তবু কে না জানে স্বর্গরাজ্য রামরাজ্যের হাজার গুণ অধিক গুণের। সব্বাই জানে—"সেখানে দুঃখ নেই কষ্ট নেই, রোগ নেই, অভাব নেই, অসুবিধে নেই, জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, বন্যা নেই, খরা নেই, বেকার নেই, বিপ্লবী নেই, স্ট্রাইক নেই, লক-আউট নেই, লোড-শেডিং নেই, রেল বাজেট নেই, গণ-টোকাটুকি নেই, চেয়ার-টেবিল ভাঙাভাঙি নেই, চুরি ডাকাতি ছিনতাই রাহাজানি, খুন জখম, মড়ক মহামারি কিছুই নেই। এমন কি জন্ম-মৃত্যুর বালাই পর্যন্ত নেই।

যারা আছে, তারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। সাজানো দাবার ছকের মত, যেখানকার ঘুটি সেখানেই বসে থাকবে, কেউ তাদের নিয়ে খেলে আর কাটা পড়িয়ে পড়িয়ে লণ্ডভণ্ড করবে না। করার কোনো উপায় নেই। কাজেই স্বর্গে কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়।

ছিলও না। কিন্তু হঠাৎ উট্‌কো এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই স্বর্গের তাবৎ চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরা এক জরুরী আলোচনা সভার ডাক দিয়েছেন।

স্থান—ইন্দ্রপুরী।

কাল—বৈকাল।

সভাপতি—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা।

প্রধান অতিথি—গোলোকেশ্বর বিষ্ণু।

উদ্বোধক—দেবাদিদেব মহাদেব।

বক্তা—তেত্রিশ কোটির অনেকে।

খবর চলে এসেছে, কার্ডও এসে গেছে।

মহাদেবের খেয়াল ছিল না, ভাঙ খেয়ে ঝিম হয়ে পড়েছিলেন, নন্দীর ধাক্কায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, "তাইতো, এ যে দেখি বেলা পড়ে এসেছে। আর একটু আগে ডাকবি তো?"

নন্দী মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে ডাকাডাকির পাট অনেক হয়ে গেছে, এখন নিরুপায় হয়েই গা ধাক্কিয়েছি। কোন্ বাঘছালটা পরবেন? দি রয়েল বেঙ্গল টাইগারেরটা? না রাজস্থানের পর্বত উপত্যকারটা? না আমাদের এই কৈলাস ভূমিরই—"

মাহদেব ততক্ষণে লাফিয়ে উঠে পড়েছেন। তাড়াতাড়ি ধমক দিয়ে বললেন, "আমার ব্যাপার নিয়ে তোদের মাথা ঘামাতে হবে না। নিজেরা দুই অবতার চটপট সাজ সেরে নে দিকিন। পাঁচজনের দেখাদেখি তোদের তো আজকাল খুব ফ্যাসান বেড়েছে দেখতে পাই। কার্তিককেও ছাড়িয়ে যাস।"

ভৃঙ্গী তাড়াতাড়ি সামনে এসে দু'হাতে কুর্নিশ করতে করতে বলল, "প্রভু, আপনি আপনার ওই আধবোজা চোখে আমাদের মত অভাগাদের দেখতে পান?"

মহাদেব বললেন, "কী বললি? আধবোজা চোখে? তোরা দুটো তো চোখের সামনেই ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছিস, তোদের ভাব বদল তো ঘুমিয়েও দেখতে পাই। সেটা কিছু না। আমার এই অর্ধনিমীলিত নয়নে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এই তিন ভুবনের প্রতিটি প্রাণীকে অবলোকন করে থাকি, বুঝলি?······ কিন্তু এটা কী হল ভৃঙ্গী? সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের বদলে হঠাৎ কুর্নিশ মানে?"

—মানে খুব সোজা প্রভু! কৈলাসপুরীর ভূমি আজকাল যা খোয়াখাপরা, 'সাষ্টাঙ্গে'—বুক পেট হাঁটু সব ছড়ে যায়। তাই—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা চটপট। আমি যা পারবো নিজে দেখে নেব।

দুর্গা সিদ্ধি বাটতে বসেছিলেন, মহাদেব হুড়মুড়িয়ে এসে পড়ে বললেন, "পার্বতী, শীগগির আমার একটা ফ্রেশ বাঘছাল বার করে দাও দিকি।

আজকাল আবার লক্ষ্মী-সরস্বতী আমার সাজপোষাক নিয়ে বড় খুঁৎখুঁৎ করে। আমি নাকি নোংরা ময়লা, ছাইমাখা সেকেলে।”

দুর্গা শিল ছেড়ে উঠে পড়ে আঁচলে বাঁধা চাবির রিং থেকে বাঘছালের ট্রাঙ্কের চাবিটা বাছতে বাছতে বলেন, “তা খুব মিথ্যেও বলে না।”

—ওঃ! ওই ফ্যাসানি মেয়েদের সাপোর্ট করা হচ্ছে! তা কী করতে হবে আমায়? এই বুড়ো বয়সে কার্তিকের মত ফুল কোঁচা ধুতি পরতে হবে? না কি নন্দী-ভৃঙ্গীর মত হাফপ্যান্ট? দাও দাও, শীগগির দাও, আমাকেই যে ছাই সভার উদ্বোধক করে বসে আছে। সকলের আগে যাওয়া দরকার।

দুর্গা ত্রি-নয়নের ভুরু কুঁচকে বললেন, “ছেলে-মেয়েরা তাই বলাবলি করছিল বটে। তা হঠাৎ স্বর্গরাজ্যে আলোচনা সভা?”

—তাইতো দেখছি। উদ্যোক্তা অবশ্য ইন্দ্র, তবে শুনছি ওর মধ্যে আছে সকলেই। সমস্যাটা সকলেরই তো!

—বলি সমস্যাটাই বা কী? আলোচনাই বা কিসের?

মহাদেব তাড়াতাড়ি জটা সামলে বাঘছাল বদলাতে বদলাতে বলেন, “কেন? তুমি শোনোনি?”

পার্বতী মুখ ভার করে বলেন, “কে আমায় বলতে এসেছে?”

মহাদেব আঙুল দিয়েই জটাজুটটি আঁচড়ে নিয়ে একটু হাসেন, “হুঁ! এখন বলতে আসবে কেন? যখন নিজেরা পেরে উঠবে না তখন দেবী মহামায়া। মহাশক্তির কাছে ছুটে আসবে। যাক, সভায় কী হল না হল এসে বলব—এখন বড় তাড়াতাড়ি। ব্যাপারটা হচ্ছে, মর্তলোকে মানুষের বড় বাড় বেড়েছে, তাই কীভাবে তাদের শায়েস্তা করা যায় তাই ভাববার জন্যেই—”

কথা শেষ হল না,—মহামায়া মহাশক্তি হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠলেন, “কী? মর্তলোকে মানুষের বড় বাড় বেড়েছে?”

মর্তলোকটা যে দুর্গার বাপের বাড়ি, সেটা হঠাৎ ভুলে গেলেন মহাদেব, তাই দুর্গার জ্বলে ওঠার কারণটাও বুঝলেন না, বললেন, “তাইতো বলছে সবাই। চাঁদের সাম্রাজ্য তো প্রায় দখল করে নিয়েছে, এখন শুক্রগ্রহের দিকে

৮



...বাঘছাল বদলাতে বদলাতে বলেন, "কেন? তুমি শোনোনি?"

হাত-পা বাড়াচ্ছে, অচিরেই গিয়ে খুঁটি গাড়বে মনে হয়। তাহলে? তারপর? একে একে তো দেবলোকের সব জমি জবরদখল করে নিয়ে দেবতাদের শান্তি বিঘ্নিত করবে ওই দুর্ধর্ষ মানবজাতি।"

—দুর্ধর্ষ?

দুর্গা কঠিন গলায় বলেন, "তা বলবেন বৈ কি প্রভু! যে হতভাগ্যরা প্রতিনিয়ত সমস্যায় আর দুর্দশায় ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে, তাদের সম্পর্কে এইরকম নিষ্ঠুর উক্তি আপনাকেই মানায়। সর্বদা তো ভাঙ খেয়ে ব্যোম্ হয়ে আছেন, দেখেন না-তো কিছু।"

মহাদেবও চড়া গলায় বলেন, "না বুঝে শুঝে কথা বলা তোমার একটা দোষ দুর্গা। ব্যোম্ হয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব খবরই রাখি। যাক, আর তর্কের সময় নেই। জানো তো আমি ভালো থাকলে ভোলানাথ, রাগলে প্রলয়ঙ্কর! হয়তো দুম্ করে রেগে যাব। চলছি—"

কৈলাসভূমি স্বর্গভূমির কিছু নীচের দিকে, উপত্যকা স্থানে। এই সূত্রেই মর্তলোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ কিছু কিঞ্চিৎ বেশী। আর এই সূত্রেই তো শিবের গিরিরাজের জামাই হয়ে পড়া।...তা সে যাক্। ইন্দ্রপুরীতে উঠতে মহাদেবকে কিছুটা পাহাড় লঙ্ঘন করতে হয়। তাই তিনি আর কালবিলম্ব না করে ত্রিশূল উঁচিয়ে এগিয়ে পড়েন।

দুর্গা পিছন থেকে পিছু না ডেকেই চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "একটু দাঁড়িয়ে যান প্রভু, আমি যাব ওই 'অন্যায়' সভায়।"

মহাদেব ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "তুমি? তুমি যাবে কী করে? তোমার কার্ড কোথায়?"

—কার্ড? আমায় কার্ড না হলে ঢুকতে দেবে না?

মহাদেব আরো খানিক উঠে যেতে যেতে বলেন, "সে কথা বলছি না। তোমায় আটকায় এতো সাধ্য কার? তবে মান-মর্যাদার প্রশ্ন একটা আছে

তো? মনে করো তোমারই পূর্বজন্মের পিতৃদেব দক্ষরাজার সভায় বিনা নিমন্ত্রণে গিয়ে কী পরিণামটা হয়েছিল?"

দুর্গা গুম হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মহাদেব গটগট করে এগিয়ে গেলেন।

দুর্গা দাঁড়িয়েই রইলেন। পাথরের প্রতিমার মত।

জয়া বিজয়া একবার করে উঁকি মেরে দেখে গিয়ে ভয়ে নীল হয়ে লক্ষ্মী সরস্বতীর কাছে আবেদন নিবেদন করছে, "দিদিরানীরা একটা কিছু বিহিত করুন, মাকে দেখে ভয় লাগছে। মুখ লাল, চোখে আগুন, হাত মুষ্ঠিবদ্ধ। কী হবে?"

সরস্বতী শান্তভাবে বলেন, "মাকে দক্ষযজ্ঞের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেওয়াটা পিতৃদেবের সঙ্গত হয়নি। যাক্—গুরুজনদের কাজের সমালোচনা অসঙ্গত। এখন দেখা যাক মায়ের মধ্যেকার সদ্য-জেগেওঠা সংহারশক্তিকে কি করে শান্ত করা যায়।"

—দাদাদের ডাকব?

লক্ষ্মীর প্রশ্নে সরস্বতী মৃদু হাসেন; "তোর আমার থেকে কি দাদাদের বুদ্ধি বেশী রে লক্ষ্মী? বিশেষ করে মাকে ম্যানেজ করার ব্যাপারে? যখনি পিতৃদেবের সঙ্গে মায়ের লাগ্-ঝমাঝম লেগে যায় তখনই তো দাদারা চম্পট দেয়। যা করতে করি তুই আমি আর জয়াদি বিজয়াদি।"

"তা' যা বলেছিস সরস্বতী,—"

লক্ষ্মী বলেন, "বড়দা তো ফুলবাবু, কোঁচা সামলাতেই ব্যস্ত, আর ছোড়দা তো নামেই মালুম। গোবর গণেশ! ···নন্দীদা ভৃঙ্গীদাও আবার তেমনি! দুষ্টুমির রাজা। তাল করে বেড়ায় কখন কার সঙ্গে কার খটাখটি বাধিয়ে দিতে পারে।"

সরস্বতী বলেন, "হবে না? দেবর্ষি নারদের ভাগ্নে যে ওই যমজ ভ্রাতৃযুগল।"

লক্ষ্মী অবাক হয়ে বলেন, "অ্যাঁ! তাই নাকি? কই, কখনো তো শুনিনি!"

সরস্বতী একটু হাসেন, "তুই আর শুনবি কোথা থেকে? টাকার বাণ্ডিতেই মগ্ন থাকিস! আমায় যে সব জানতে হয়, সব বুঝতে হয়। বিশ্বভুবনের যত অজ্ঞানতা নাশের দায়িত্ব তো আমার ঘাড়েই চাপিয়ে রেখেছেন নারায়ণ।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলেন, "আমার ওপরও কিছু কম চাপাননি—এখন চল মাতৃদেবীর ব্যাপারটা দেখিগে।"

লক্ষ্মী বললেন বটে, কিন্তু যা করে তোলবার তা দেবী সরস্বতীই করলেন।

লক্ষ্মী তো গিয়েই ঝপ করে বলে বসেছিলেন, "মাগো জগজ্জননী মা, মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে? কার্ড যখন দেয়নি তখন যাওয়া চলে না। বিনা কার্ডে মানহানি!"

তখন দুর্গা আরো অগ্নিমূর্তি হয়ে বলেছিলেন, "জগজ্জননী কথাটার মানে জানিস লক্ষ্মী?……না জানলে সরস্বতীর কাছে শিখে নিস। বিপদ তো ওইখানেই—জগতের জননী। কিন্তু মর্তভূমিটা কি জগৎ ছাড়া? সেখানের কথা ভাবতে হবে না আমায়? তুই তো নিজের চক্ষেই দেখে আসছিস লক্ষ্মী, কি হাল্ আমার বাপের বাড়ির দেশের। দুঃখ, কষ্ট, রোগ-শোক, অভাব-অসুবিধে, জ্বালা-যন্ত্রণা, বন্যা-খরা, চুরি-ছিনতাই, মড়ক-মহামারি, কত কত সমস্যা! এক ঢেউ যায় তো আর দশটা ঢেউ এসে পড়ে। স্বার্থপর দেবতারা তাকিয়ে দেখে এসব। নিজেদের কোলে সব ঝোলটি টেনে বসে আছেন সবাই। তার সাক্ষী স্বর্গ। সব সুখ, সব আহ্লাদ তার জন্যেই মজুত। কেন? কেন এতো অসাম্য? কেন এমন তারতম্য? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তো স্বর্গ মর্ত পাতাল এই তিন ভুবনই সৃষ্টি করেছিলেন? তবে?……অবশ্য পাতালের অবস্থা ঠিক জানি না, তেমন যোগাযোগ নেই। তবে মনে হয় অবস্থা খুবই শোচনীয়, নচেৎ একটা সার্বজনীন পূজো করে না? যাক সামনের বছর শরৎকালে যখন মর্তলোকে যাবো, আশা করছি ততদিনে পাতাল রেল চালু

হয়ে যাবে, তখন রেলগাড়ি চড়ে দেখে আসবো একবার।……কিন্তু মর্তকে তো দেখছি! বছর বছরই দেখছি! দুর্দশা বেড়েই চলেছে। আর এর ওপর কিনা দাম্ভিক স্বার্থপর আত্মসর্বস্ব ইন্দ্ররাজটি আলোচনাসভা ডেকেছেন—কী করে মর্তমানবকে শায়েস্তা করা যায়! ভাবতে পারিস?"

মায়ের এই রোষানল ঠাণ্ডা করতে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বলেছিলেন "তোমার কষ্টের জন্যেই বলছি।"

—থাক, আমার কষ্ট আর তোদের দেখতে হবে না। বলে কিনা ওসব ভুলে যাও। তা তুই তো বলবিই। বড়লোকের বন্ধু তুই, গরীবের যম। তুই আমার মর্মকথা বুঝবি না।

দেখে শুনে লক্ষ্মী সরে পড়েছিলেন।

অতঃপর সরস্বতী হাল ধরেছিলেন।

তাঁর ক্যাপাসিটি আলাদা।

তিনি হচ্ছেন বাক্যের অধিশ্বরী বাগ্‌দেবী।

তিনি যতটা পারলেন, বাক্‌জাল বিস্তার করে মাকে কিছুটা নরম করে ফেলে প্রস্তাব করলেন, সভা চলন্তকালে দুর্গাকে পুরোভাগে রেখে লক্ষ্মী-সরস্বতী ও জয়া-বিজয়া একটি মৌন মিছিল করে প্রতিবাদের মূর্তিতে একেবারে সভাস্থলে গিয়ে হাজির হবেন এবং তখন দুর্গা আপন বক্তব্য পেশ করবেন।

বিনা আমন্ত্রণে সভায় গিয়ে বসা, মানের হানি, কিন্তু প্রতিবাদ মিছিলে তো মানের হানি নেই।

প্রস্তাবটা দুর্গার পছন্দ হল।

বললেন, "তবে চটপট তৈরি হয়ে নে।"

সরস্বতী বললেন, "তৈরি হবার কিছু নেই, দুঃস্থ দুর্গতদের জন্যে আবেদন করতে যাচ্ছি—যেমন আছি তেমনি যাব।"

জয়া বিজয়া আড়ালে হাসল।

রাতদিন তো সেজেই থাকেন দিদিরানীরা, নতুন করে আর কী তৈরি হবেন?

ওঁরা যখন নিঃশব্দে নীরবে ইন্দ্রপুরীর তোরণে গিয়ে দাঁড়ালেন দ্বারী সসম্ভ্রমে দ্বার ছেড়ে দিল। সগৌরবে ঢুকে পড়লেন ওঁরা একেবারে সভাগৃহের মধ্যস্থলে।

আলোচনাসভার তর্কবিতর্ক তখন তুঙ্গে।

দেবতারা দুভাগে বিভক্ত হয়ে দুরকম মত ব্যক্ত করছেন, সেই সময় এই কাণ্ড। সকল দেবতাই তড়বড়িয়ে নিজ নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, বাদে মহাদেব। তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল দেখে। ইস, সভাটা প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, সভাপতির ভাষণ আর প্রস্তাবটা পাশ হয়ে যাওয়া এইটুকু বাকি, এখন আবার একী বিঘ্ন!

কিন্তু কী আর বলবেন?

পাঁচজনের সামনে তো আর বাড়ির লোককে কিছু বলা যায়না! নারায়ণ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "দেবী ভগবতী, বিশ্বজননী, আপনি হঠাৎ কেন এই ফচ্‌কে বিতর্ক সভায়?"

দুর্গা রাগ চেপে গম্ভীর হয়ে বললেন, "যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর উপস্থিত, সে সভাকে 'ফচ্‌কে-সভা' বলা কি সঙ্গত হল নারায়ণ?"

নারায়ণ থতমত খেয়ে বললেন, "না মানে, আমরা তো—ইয়ে মানে ইন্দ্র ডেকে এনেছেন।"

—সে তো আনবেনই। ইন্দ্রর যখন নিজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপার। কিন্তু আপনারা তো এসেছেন? কিন্তু সে যাক্। সভার প্রস্তাব পাশ হয়ে গেছে?

—আজ্ঞে না। এখনো দু'দলে মতভেদ চলছে—

ইন্দ্রই তাড়াতাড়ি সামলান, "এই এরা বলছেন মানবজাতির দুরন্ত স্পর্ধাকে নির্মূল করতে, উচিত হচ্ছে ওদের সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁজি কেড়ে নেওয়া—"

সরস্বতী চমকে বলে ওঠেন, "কেড়ে নেওয়া? এই হাজার হাজার বছর ধরে ওরা আমার সাধনা করে যা লাভ করেছে, তা' কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চলছে?"

ইন্দ্র মুখ ভার করে বলেন, "উপায় কী? মানুষের যে বড় বাড় বাড়ছে। শুনেছেন তো সবই? তা এতেই আপনি চমকে যাচ্ছেন দেবী বীণাবাদিনী? আর অপরদল যে বলছেন মানুষ জাতটাকেই কিছুদিনের মত খতম করে দেওয়া হচ্ছে বেস্ট। একটা প্রলয়ঙ্কর তুষারবর্ষণ পাঠিয়ে দিলেই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান অগ্রগতি দুঃসাহস সমেত হাজার বছরের মত তুষারচাপা!...... অতঃপর আবার নতুন করে—জীবনের সূচনা—"

দুর্গা এতোক্ষণ শুনছিলেন, এবার ফেটে পড়লেন, বললেন, "বটে? হাজার বছরের মত তুষারচাপা! এই দলে নিশ্চয়ই দেবাদিদেবের সমর্থন?"

মহাদেব তাড়াতাড়ি বলেন, "বাঃ আমি কেন? আমায় বলছ কেন? আমি কী জন্যে?"

দুর্গা রোষকষায়িত নেত্রে বলেন, "কী জন্যে আর? বছরে একবার চারটে দিনের জন্যে বাপের বাড়ি যাই, সেটাও সহ্য হচ্ছে না। আর এই তেত্রিশ কোটিরও হিংসে রয়েছে।"

"হিংসে!"

সমস্বরে বিস্ময় প্রকাশিত হয় তেত্রিশ কোটি কণ্ঠে। "হিংসে!"

মহামায়া মহাতেজে বলেন, "হিংসেই তো! দেবতাদের মধ্যে আপনাদের আর কার গৃহিনীর বাপের বাড়ি আছে? ছেলেমেয়েদের মামার বাড়ি আছে? নিজেদের শ্বশুরবাড়িতে আদর আছে? নেই। কারুরই নেই। আমার সংসারটি দেখে তাই হিংসে।"

মহাদেব লজ্জা পেয়ে বলেন, "কিন্তু দেবী, তুমি যে তখন বলছিলে, মর্তবাসীরা নাকি নিদারুণ দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, হ্যানো নেই ত্যানো নেই, তারা অতি হতভাগ্য। তবে আবার কে তাদের হিংসে করতে যাবে?"

দুর্গা সতেজে বলেন, "যাবে কী? যাচ্ছে তো? এতো সমস্যার মধ্যেও তারা একটু জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে উন্নতির সোপান তৈরি করছে, অমনি তাদের ধ্বংস করার তাল—"

ইন্দ্র মিনমিন করে বলেন, "ওই সোপানটিই যে সর্বনেশে! শেষে যদি স্বর্গে এসে হানা দেয়?"

—দেয় দেবে!

মহামায়া দুর্গা রেগে বলে ওঠেন, "চিরদিন আপনারাই বা স্বর্গে একাধিপত্য করবেন কেন? এই যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। এই ত্রিভুবন আপনিই সৃষ্টি করেছেন, অথচ একদিকে শুধুই সুখ, অন্যদিকে শুধুই দুঃখ, এটা কী আপনার মত জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত হয়েছে?"

ব্রহ্মা আক্রমিত হয়ে এক সঙ্গে চতুর্মুখে ফড়ফড়িয়ে বলে ওঠেন, "দুঃখ ওদের 'আমি' দিইনি দেবী ভগবতী। সমস্ত দুঃখ কষ্ট অভাব অসুবিধে জ্বালা-যন্ত্রণা সমস্যা অশান্তি ওদের নিজেদের সৃষ্টি। মানুষের মধ্যে আমি বালিশে তুলো ঠাসার মত অনেক সুবুদ্ধি শুভবুদ্ধি ন্যায় অন্যায় বোধটোধ ঠেসে ভরে দিয়েছিলাম। কিন্তু মানুষ যদি সেগুলো কাজে না লাগিয়ে দুর্মতি দুর্নীতি নিয়েই থাকে, আমি কী করব? লক্ষ্মীর সাধনা করতে গিয়ে—"

এখন হঠাৎ লক্ষ্মী বলে ওঠেন, "তা ওই দুর্নীতি দুর্মতিগুলো কে ঢুকিয়ে রেখেছিল ওদের মধ্যে?"

ব্রহ্মা মাথা চুলকে বলেন, "সেও অবশ্য আমিই—"

—কেন? ওগুলো না দিলেই পারতেন!

—বাঃ তা বললে কী হয়? তাহলে আর মানুষের মহত্ব প্রকাশের পথ কোথায় থাকবে? ওদের ভালর জন্যেই—

দুর্গা বললেন, "থাক আর ওদের বেশী ভালয় কাজ নেই। মানুষকে শায়েস্তা করার চিন্তার আগে স্বর্গ থেকে দেবদূতের একটা 'সুমতি মিশন' প্রেরণ করুন মর্তলোকে। তারা ওদের মধ্যে থেকে ওইসব নিজ অনিষ্টকর দুর্মতি-টুর্মতিগুলো বিদূরিত করে পৃথিবীতেও স্বর্গরাজ্য স্থাপন করুক। ব্যস্!......দেবতাদের দেববুদ্ধিতে এটা মাথায় এলো না, মাথায় এলো কিনা ওদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুঁজি কেড়ে নিয়ে বোকা-হাবা করে দাও, অথবা হাজার হাজার বছরের মত তুষার চাপা দিয়ে ফেলে রেখে আবার গুহাবাসী মানবের

যুগ থেকে শুরু কর। ছিঃ! এগুলো বুঝি খুব শুভবুদ্ধি? নিজেদের গদিটি মজবুৎ থাকলেই হল, কেমন? আমাকে যখন আপনারা বিশ্বজননী বলেন, তখন আমি সমগ্র বিশ্বের দিকেই সমদৃষ্টি রাখবো।"

দেবতারা গাত্রোত্থান করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ঠিক আছে, 'সুমতি মিশন' পাঠানোর ব্যবস্থাই হোক।......"

দেবতাদের ইচ্ছামাত্রই ব্যবস্থা।

একঝাঁক দেবদূত 'সুমতি-মিশন'-এর ব্যাজ এঁটে স্বর্গলোক থেকে অবতরণ করলেন। তাঁদের পল্‌কা হাল্‌কা সূক্ষ্ম শুভ্রবসনাবৃত দেবশরীর মুহূর্তে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

"কতদিনের জন্যে যাচ্ছে ওরা?" জিজ্ঞাসা করলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

ইন্দ্র বললেন, "আপাতত মাস তিনেক।"

—সেরেছে!

অশ্বিনীকুমাররা বললেন, "তার মানে বর্ষার সময়টা পড়ে যাবে।......এখন মর্তলোক থেকে না ব্যাধিবীজ এনে স্বর্গে ছড়ায়। শুনতে পাচ্ছি আবার নাকি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটেছে পৃথিবীতে। তাছাড়া—সর্দি-কাশি-ফ্লু-ডিসেন্ট্রি"—

জয়া বিজয়া বলে উঠল, "তাতে ভয় খাবার কী আছে কবরেজমশাই? দেবতাদের তো আর মরণ নেই!"

অশ্বিনীকুমাররা যমজ ভাই, যা বলেন, দুজনে একসঙ্গেই বলেন। "মরণ না থাক, অসুস্থতা তো ঘটতে পারে?"

জয়া খরখরে মেয়ে, বলে উঠল, "ঘটুক গে। মানুষ এত ভুগছে, দেবতারাও না হয় একটু ভুগবেন।"

সেদিনের মত সভাভঙ্গ হল।

অথবা পণ্ড হলও বলা যায়।

'তুষারঝড়' আপাতত স্থগিত রইল। 'সুমতি-মিশন' ফিরে এসে যা



ইন্দ্র বললেন, আপাতত মাস তিনেক

রিপোর্ট দেবে সেই বুঝে কাজ হবে। মানুষের যদি মতিবুদ্ধি ভাল হয়, তাহলে আর এতো ভাবনা কী?

কিন্তু কই তারা যে আর ফিরে আসে না। দিন যায়, মাস যায়—তিন মাস কাটতে কতক্ষণ?

দেবলোক থেকে ঘনঘন টেলেক্স যায় হেড-দেবদূতের নামে, সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে, 'খুব ব্যস্ত, পরে খবর জানাচ্ছি।'……'আরও কিছুদিন এখানে থেকে যাবার ইচ্ছে।'

এদিকে অতগুলি দূত চলে যাওয়ায় স্বর্গ-রাজ্যে রীতিমত বিশৃঙ্খলা। রাজ্যটা তো ছোটখাটো নয়! দূতেরাই তো রিপোর্টার আর ডাকপিওনের কাজ করে।

ইন্দ্রই স্বর্গাধিপতি, অসুবিধেটা তাঁরই বেশী, অফিস চলা দায়। চটে-মটে একদিন কৈলাসে এসে হানা দিলেন। তবে শান্তভাবে বললেন, "প্রভু, মিশন পাঠিয়ে তো বড় বিপদ হলো। ওরা যে আর আসতেই চাইছে না।"

মহাদেব বললেন, "সে কী? ওই নোংরা ধূলো আধিব্যাধি-ভরা জায়গা ছেড়ে দেবদূতেরা আসতে চায় না? ব্যাপার কী বলতো?"

—তাইতো ভাবছি।

মা দুর্গা অন্দরমহলে সিদ্ধি বাটছিলেন, সেখান থেকেই গলা বাড়িয়ে বললেন, "স্বরযন্ত্র ক্ষেপণ করে দেখোনা ইন্দ্র?"

ইন্দ্র গলা বাড়িয়ে বললেন, "সে কী আর বাকি রেখেছি মা? কেবলি বলে, খুব ব্যস্ত, আরও কিছুদিন থাকতে চাই।"

লক্ষ্মী সরস্বতী ঘরে বসেছিলেন। শুনতে পেয়ে মুখ টিপে হেসে বললেন, "বুঝেছি।"

জয়া বিজয়া ঘর সাফ করতে করতে হেসে বলল, "বুঝেছি।"

নন্দী বলে উঠল, "বুঝবে না কেন? সেদিনকে 'দূরদর্শন' যন্তরটা ধরে দেখালাম না তোমাদের ওদের চেহারা? কিন্তু সে কথাটি তো বলা যাবে না।"

দুর্গা একটু চেঁচিয়ে বললেন, "যে কাজে পাঠিয়েছিলে, তার কিছু হয়েছে।"

—কই, কিছুই তো বুঝি না। কী যে করে বেড়াচ্ছে কে জানে?

এ সময় ভৃঙ্গী দু'গেলাস সিদ্ধির শরবৎ এনে দু'জনের সামনে বসিয়ে দিয়ে কুর্নিশ করে বলল, "আমার সঙ্গে হেড্‌দা'র বন্ধুত্ব আছে। একটা ট্রাঙ্ককল করে দেখব? আমায় হয়তো মনের কথা বলতে পারে।"

ইন্দ্র ব্যাকুল হলেন, "টেলিফোন আছে? তবে তাই কর বাপু। উত্তরটা শুনে যাই।"

ভোলানাথের সংসারে ফোন, ফ্রীজ, টি-ভি এসব থাকার তো কথা নয়, কিন্তু নন্দী ভৃঙ্গীর চেষ্টায় সবই হয়েছে।

ভৃঙ্গী কোথা থেকে খানিকটা দড়িদড়া আর দুটো খুঁটি নিয়ে এসে চটপট পুঁতে দড়ির দু'আগায় দু'টো ফেলে-দেওয়া গাঁজার কলকে গেঁথে তার একটা কানে লাগিয়ে আর অন্যটা মুখে লাগিয়ে কুড়ুং কুড়ুং খুটখাট কী যেন করে বলে উঠল, "হ্যালো। কে হেড্‌দা? আচ্ছা, তোমাদের খবর কী? কী বললে? আর ফিরে আসতে ইচ্ছে নেই? বল কী? কেন? কী আশ্চর্য। ওখানে স্বর্গের থেকে বেশী মজা?"

......তা' তোমাদের তো সূক্ষ্ম শরীর, ওখানে চলা-ফেরা করছ কী করে? কী বললে? অসুবিধে নেই? বরং সুবিধে? সিনেমা দেখতে টিকিট কাটতে হয়না, জিনিসপত্র কিনতে পয়সা দিতে হয়না। আর—"

শুনতে শুনতে ইন্দ্রর মেজাজ গেল চড়ে। হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ভৃঙ্গীর হাত থেকে সেই গাঁজার কল্‌কের রিসিভার কেড়ে নিয়ে কানে মুখে চেপে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "চমৎকার! 'সুমতি-মিশন'-এর উপযুক্ত কাজ বটে। অদৃশ্য দেহের সুযোগ নিয়ে লোক ঠকাচ্ছো?"

ওদিক থেকে স্বর ভেসে এলো, "কে কথা বলছেন? স্যর? সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাচ্ছি।"

—রাখো তোমার প্রণিপাত! বলি—যা করতে পাঠালাম তার কী হল?

—ওঃ! এই আমাদের 'মিশন'-এর কথা বলছেন?

একটু হাসির আওয়াজ এলো, "কাজটা অসম্ভব!"

—অসম্ভব?

—আজ্ঞে স্যর! ফুঁ দিয়ে হিমাচল পর্বতকে উড়িয়ে দেবার মত, গণ্ডূষ করে করে মহাসমুদ্রকে শুকিয়ে ফেলার মত, এক নিমেষে আকাশের সব তারা গুণে ফেলতে পারার মতই অসম্ভব। এই নির্বোধ জাতটার হাড়ে শিরে অস্থিতে মজ্জায় দুর্মতি!

ইন্দ্র গলা চড়িয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বেশ। তবে দলবল নিয়ে চলে এসো।......কী? কী বললে? ছেলেগুলো আসতে চায়না?......একটাও না? ওই হতভাগা পৃথিবীতেই থেকে যেতে চায়? মানে কী? জোরে বলো, শুনতে পাচ্ছিনা।"

গাঁজার কল্‌কে ফেটে যাবার মত এমন গাঁক গাঁক করে আওয়াজ এলো যে, কল্‌কে ছাড়াই অন্যদের কান ফাটবার জোগাড়! যে যেখানে আছে শুনতে পায়—

"মানে আর কী? বলছে—এতো আহ্লাদ, এতো আমোদ, এতো মজা, এ ছেড়ে সেই নিথর-পাথর স্বর্গলোকে আবার কে যাবে?"

ইন্দ্র রেগে বললেন, "স্বর্গে নেই, এমন কী মজা আছে শুনি?"

আবার 'গাঁক গাঁক',—"তা আছে বৈকি প্রভু!......ওরা বলছে, স্বর্গে ক্রিকেট ম্যাচ্ আছে?"

—কী? কী আছে?

—আজ্ঞে, ক্রিকেট ম্যাচ।

—সেটা আবার কী জিনিস?

—কী জিনিস, সে কি আর বলে বোঝানো যাবে প্রভু? শুধু এইটুকু বলতে পারি, পৃথিবীর এপার থেকে ওপার, এইতে তোলপাড়। দেখলে পাগল, না দেখতে পেলে পাগল।

—তা আসলে সেটা কী? যাত্রাপালা? নাচগান? বহুরূপীর খেলা? নাকি—কী, ওসব কিছু না? তবে?

—বললাম তো, বলে বোঝানো যাবেনা।

ইন্দ্র একটু গুম্ হয়ে গেলেন, তারপর বললেন, "বেশ! ওইটা দেখে নিয়ে চলে এসো সবাই।"

ওদিকে একটু হাসির শব্দ, "হবেনা স্যর! এরা সব কাছেই রয়েছে, বলছে ফিরে আর যাবে না তারা!"

—কেন শুনতে পাই? হঠাৎ স্বর্গ কী অপরাধ করল?

—বলছে, স্বর্গ তো একটা ফসিল জিনিস। ওখানে কোনো বৈচিত্র্য আছে? কোনো নতুনত্ব আছে? ফাংশন আছে? সার্বজনীন পূজো আছে? যা ইচ্ছে তাই করার স্বাধীনতা আছে? ফিল্মের গান আছে? গোয়েন্দা গল্পের বই আছে? কফি হাউস আছে? ফুচ্‌কা আছে? জলকচুরি? গোলগাপ্পা? দইবড়া? দোসা? আলুকাবলি? ছোলে? পকৌড়ি? ঝালঝুরি?...... চাট্‌নীহজ্‌মী? মশ্‌লা মুন?......একটার কিছু আছে?"

শুনতে শুনতে ইন্দ্র শিউরে উঠে বললেন, "নোংরা মর্তভূমে গিয়ে ওইসব খাচ্ছো তোমরা? তার মানে ব্যাধিবীজে স্বর্গলোক একেবারে দূষিত করে ফেলতে চাও?......কী? কী বললে, সত্যিই তোমরা আর ফিরছোই না, অতএব সে ভয়ের প্রশ্ন নেই?......এ কী অদ্ভুত স্বেচ্ছাচার? পৃথিবীর জীবের মত তোমরাও নিয়ম লঙ্ঘন করতে শুরু করলে? 'সুমতি-মিশন'-এর ব্যাজ পরে গিয়ে দুর্মতি সংসদের সদস্য হলে?......ওহো হো—হাওয়া বাতাসের গুণ?......ঠিক আছে, জাহান্নামে যাও তোমরা। কিন্তু আমার রাজ্যের কাজগুলো চলবে কী করে? এক ঝাঁক লোক চলে গেছ তোমরা।......তাহলে ওই এক ঝাঁক মানুষকেই কালেকশান করে তোমাদের বদলে পাঠিয়ে দাও।"

গাঁক গাঁক কণ্ঠ আবার বলে উঠল, "এ কী বলছেন প্রভু? কাল পূর্ণ না হলে কী করে পাঠাবো? আর কার কখন কাল পূর্ণ হচ্ছে না হচ্ছে, কে জানতে যাবে?"

ইন্দ্র মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলেন, "এটুকুও পারবে না? ঠিক আছে। সশরীরেই পাঠিয়ে দাও। যেভাবে হোক ম্যানেজ করে নেব। তিন দিনের মধ্যে পাঠাবে, বুঝলে?......ক'জন গেছ তোমরা? তোমায় নিয়ে

একুশ জন ? আচ্ছা, ওই একুশ জনকেই পাঠাবে। বুঝতে পারছো ? আর মনে রেখো, সরকারি খাতা থেকে তোমাদের এই একুশ জনের নাম কাটা গেল।"

—শুনে নিশ্চিন্ত হলাম প্রভু! আচ্ছা, তা'হলে এখান থেকেই প্রণিপাত করছি।

কেটে গেল কট করে।

ইন্দ্র হতাশ হয়ে বসে পড়ে বললেন, "স্বর্গচ্যুত হয়ে একটুও দুঃখিত হল না! আশ্চর্য! জননী ভগবতী দেখলেন ?"

জননী মৃদু হেসে বললেন, "আমি অনেক দেখেছি ইন্দ্র, তোমারই দেখতে বাকি আছে।"

তা ভগবতীর কথা ভুল হবার নয় তো!

সত্যিই দেখতে বাকি ছিল ইন্দ্রর।

মানে শুনতে।

ভৃঙ্গীর তৈরী 'টেলিফোন' নয়, ইন্দ্রর নিজেরই অফিস ঘরের টেলিফোনটা বেজে উঠল দিন তিনেক পরে—"স্যর, আমি বলছি, মর্তভূমির সব সেরা জায়গা কলকাতা থেকে।······হ্যাঁ নিশ্চয়। পৃথিবীর সর্বত্রই তো ঘুরে ফিরে দেখে ফেললাম এই ক'দিনে। এমন একখানা দেশ আর দেখলাম না।"

ইন্দ্র রেগে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, হয়েছে! লোকগুলোকে চালান করে দিয়েছ ?······আরে বাবা, ওই যে তোমাদের একুশ জনের বদলে একুশটা মানুষ চেয়েছিলাম। অ্যাঁ, কী বললে ? কেউ আসতে রাজী হচ্ছে না ?······ ওঃ! দেবদূতেরা, মিথ্যা মায়াময় মর্তলোকে গিয়ে তোমরাও কি মিথ্যা কইতে শিখে গেলে ? মানুষ স্বর্গে আসতে চায়না, এই অবিশ্বাস্য কথা বিশ্বাস করতে বলছ আমায় ? অ্যাঁ! মানুষের সারা জীবনের এই ধ্যান জ্ঞান সাধনা আশা আকাঙ্খা এ সবই তো এই স্বর্গকে ঘিরে।"

হেড দেবদূত একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলল, "সমস্তই প্রভু মরে যাবার পরের জন্যে। নেহাৎ যখন পৃথিবীটাকে ছাড়তেই হবে, তখনকার

জন্মে সুব্যবস্থা। বেঁচে থাকতে? সশরীরে? হুঁঃ! এই তিনদিন ধরে কম খোসামোদ চালিয়েছি? কম তোয়াজ করেছি? একটা মানুষ রাজী হয়না। বলে, 'কী ক্যাচ্-ক্যাচ্ করতে এলে বাপু? কাজ নেই আমার? এই সব ফেলে ছড়িয়ে নাচতে নাচতে সগ্গে যাবো? যেতে তো হবেই একদিন, তা ধীরে সুস্থে যাবো।' রাস্তায় পড়ে থাকা ভিখিরিটাও পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে থাকতে চায়। বিনামূল্যে 'স্বর্গের টিকিট' খানা তাকিয়েও দেখেনা।……আচ্ছা স্যর, টেলিফোনে অনেক বিল উঠছে, রাখি।"

কেটে দিল কট্ করে।

ভাবা যায়? ইন্দ্রের মুখের উপর কথা বলতে বলতে ফোন কেটে দেওয়া? স্বর্গ থেকে মর্তলোকের ফোনের লাইন কার নির্দেশে হয়েছিল? ইন্দ্রর নয়? পৃথিবীতে গিয়ে এতো পৃষ্ঠবল?

দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে উঠলেন ইন্দ্র, "মরতে আমি মর্তের মত বিচ্ছিরি বিদঘুটে জায়গায় 'সুমতি-মিশন' পাঠিয়েছিলাম। এক কুড়ির ওপর কাজের লোক হাতছাড়া হয়ে গেল! একেই তো ওই ধরাধামের নানান দুরন্তপনায় কাজ বেড়ে গেছে কত! এখন অফিস চালাই কী করে?"

হঠাৎ সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বীর বিক্রমে ডাক দিলেন, "বরুণ!"

"আসুক বরুণ, তার ডিপার্টমেণ্টেই তো 'জলাধার', 'তুষার ট্যাঙ্ক', বরফ পর্বত। অর্ডার দিয়ে দিচ্ছি একযোগে এক নাগাড়ে সবগুলো ঢালুক। দেখি মানুষের বাড়াবাড়ি আর কী করে বাড়ে! হাজার বছরের মত নিশ্চিন্দি! ……হতভাগারা বলে কিনা ওই বেয়াড়া বেপরোয়া পৃথিবীটা আমার রাজ্যের থেকে মজার জায়গা! আচ্ছা, আমিও দেখাচ্ছি মজা। তোরাও থাকগে যা চাপা পড়ে। অমর যখন, মরবি না অবিশ্যিই, কিন্তু হাড়ে হাড়ে টের পাবি।"

অধিক আশায়

এবারে গরমের ছুটিতে বুটুন মামার বাড়িতে এসে একটা নতুন ব্যবস্থা দেখতে পেল। বুটুনের দাদামশাই তাঁর তিন ছেলের ঘরের মিলিয়ে গোটা পাঁচেক নাতি-নাত্নীকে নিয়ে রেগুলার রামায়ণ-মহাভারতের ক্লাশ খুলেছেন।

বুটুন আসায় তাঁর আর একটি ছাত্র বাড়ল।

রোজ সন্ধ্যায় দাদামশাই রামায়ণ-মহাভারতের এক একটা কাহিনী শোনান, আর পরদিন সকালে ব্রেক্‌ফাস্টের পর যখন আমবাগানের দিকের বারান্দায় ঝিরঝিরে বাতাস আসে, দাদামশাই সেই বারান্দায় পাতা ঢাউশ চৌকিটার উপর সবকটাকে নিয়ে বসে পড়া ধরেন।

হঠাৎ হঠাৎ বলে বসবেন, "এই বলতো, জয়দ্রথ কার ছেলে? অর্জুনের কটা নাম?......রাবণ কার বরে এতো প্রতাপশালী হয়েছিল? .....রাবণের মা বাবার নাম কি ছিল?"

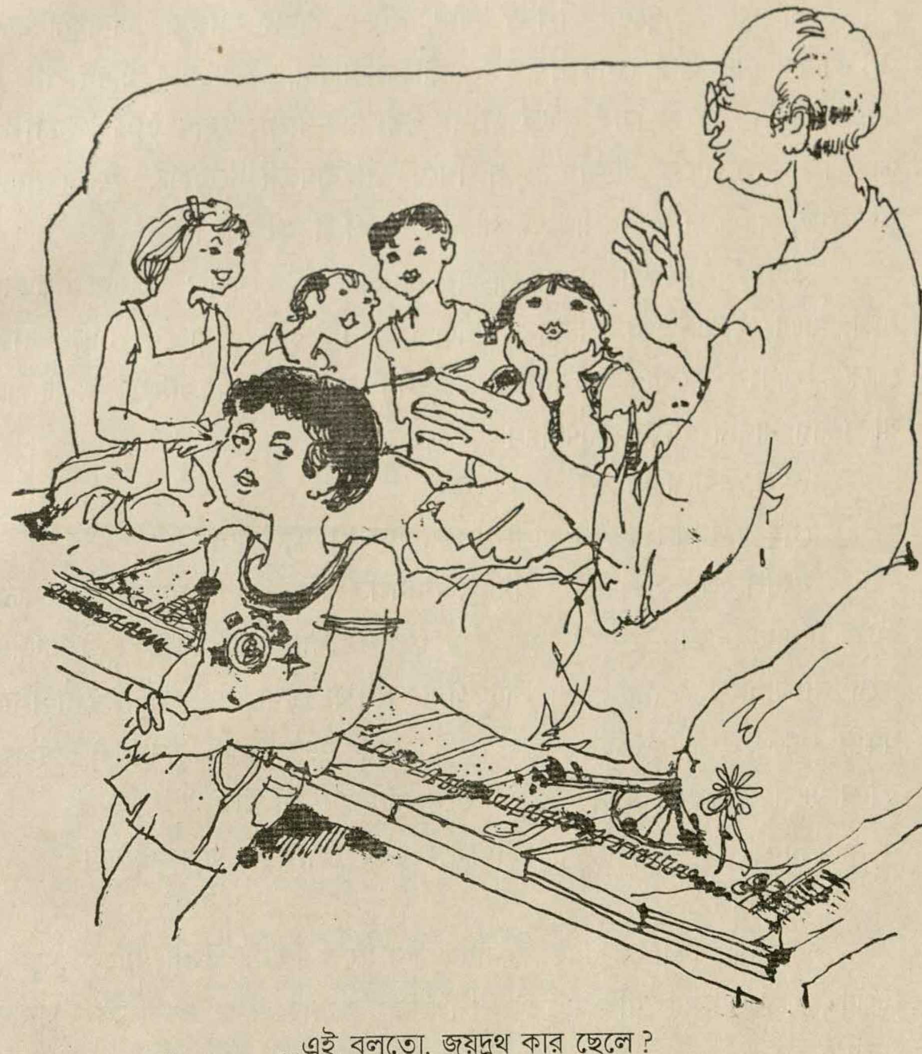
আবার হয়তো অন্যভাবেও প্রশ্ন করবেন, "আচ্ছা, মহাভারতের কোন্ মহিলা সারাজীবন চোখ থাকতেও চোখে কাপড় বেঁধে অন্ধ হয়ে থেকেছিলেন?... কোন্ গুরু তাঁর শিষ্যের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়ে গুরু-দক্ষিণা নিয়েছিলেন? পৃথিবীতে গঙ্গা আসার ইতিহাস কী?"

উঃ! এতো প্রশ্নও আছে ওই বই দুটোয়?

বুটুনের মাথা গুলিয়ে যায়।

অন্য অন্য বারে তো এই উৎপাত দেখেনি বুটুন! মালদহে মামার

বাড়ি, আর দাদামশাইয়ের বিরাট বিরাট দুখানা আমবাগান। অতএব গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি আসা মানেই মাস দেড়েক ধরে অবিরত আমের কাঁচা থেকে ডাঁশা, ডাঁশা থেকে পাকা পেটে চালান করে চলা, আর শেষ অবধি



...এই বলতো, জয়দ্রথ কার ছেলে ?

দিদিমার হাতের কাঁচা আমের 'মশলা আচার', কচি আমের 'আমচুর', আর পাকা আমের আমসত্ত্বর সম্ভার নিয়ে বাড়ি ফেরা।

ফেরার পর ছোটকাকা বলে, "বেশ জায়গায় মামাবাড়ি বানিয়ে রেখেছিস বাবা। মালদার মালপত্রগুলি এক একখানি সরেশ মাল বটে! যাক, তুই অনেক খেয়ে এসেছিস, এগুলো আমার নামে উৎসর্গ করে দে, বুঝলি ?"

তা' তাতে বুটুনের আপত্তি হয়না, সত্যি 'মামার বাড়ি'র রোমাঞ্চর স্বাদ যে কী সে তো আর ছোটকাকাকে দেখানো যায়না, ওইগুলোর স্বাদই পাক। গরমের ছুটি। আহা সেই ছুটিটি মানেই তো বই-খাতা 'হোম টাস্ক' ইত্যাদি তুচ্ছ জিনিসগুলোকে একদম ভুলে গিয়ে আমবাগানে ছুটোছুটি, ঝড়ের সময় ঝুটোপুটি, মামাতো ভাই-বোনদের সঙ্গে হাসি গল্পে কুটিকুটি।

তাছাড়া—দুবেলাই রান্নাঘরে রাজ সমারোহ। হবেনা ? বছরে একবার মাত্র আসে মেয়ে, তাও আবার একমাত্র মেয়ে। বুটুনের মা তো দাদু-দিদার মেয়ে হিসেবে সবেধন নীলমণি। বুটুনের তাই মামার বাড়ির আবদারটি সত্যিকার মামার বাড়ির আবদার!

কিন্তু এবারে এ কী ?

সেই অনাবিল সুখের মধ্যে এ আবার কী ঝামেলা ?

সকালবেলা সবেমাত্র বহুবিধ জিনিসপত্র দিয়ে—প্রাতঃভোজনটি সেরে বুটুন দিদিমার কাছ থেকে নুন আর ছোট মাসীর কাছ থেকে ছুরি সংগ্রহ করে আমবাগানে যাবার তালে লাট্টু গাঁট্টু জাম্বো বুম্বো আর ফুলটুসি মৌটুসির সন্ধান করছে, (ফুটকুলিটা নেহাৎ ছোট, ওকে ডেকে লাভ নেই।) হঠাৎ কানে এলো, "কইরে বুটুন কই ? ওহে বুটুনবাবু আ যাও।"

আর চোখে পড়ল সব কটা গিয়ে সেই চৌকিতে বসে আছে।

তারপর ?

তারপর সকালের এই মনোরম সময়টিতে কিনা উত্তর দিতে বসো, 'ঘটোৎকচের মায়ের নাম কী ?' 'পাণ্ডবরা অজ্ঞাতবাসের সময় কী ছদ্মনাম নিয়েছিলেন ?' ……'মহাপ্রস্থানের পথে শেষ অবধি যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী কে ছিল ?' 'তাড়কা বধ কখন হয় ? কার দ্বারা ?' ……'কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো হয়েছিল কেন ?'

এতো কী, কে, কবে, কোথায়-এর উত্তর দেওয়া সম্ভব?……

এ আবার কী উৎকট খেয়াল চাপল দাদুর মাথায়?

আগেও তো দাদু সন্ধ্যেবেলা গল্প-টল্প বলতেন, রবিনসন ক্রুশো, গলিভার ট্রাভলস্, সক্রেটিসের বিষপানের কাহিনী, এসব দাদুর কাছেই শুনে গেছে বুটুন, কই তখন তো গল্প বলে তারপর এমন প্রশ্নপত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে ঘা'ল করেননি? ধ্রুব প্রহ্লাদের গল্পও তো বলেছেন আগে। সেও তো রামায়ণ না মহাভারত কিসের যেন ব্যাপার। তবে? এবারেই হঠাৎ দাদুর নাতি-নাতনীদের প্রতি এমন নৃশংশতা কেন?

কারণ হিসেবে এখন শোনা যাচ্ছে—ভারতবর্ষের সারগ্রন্থ নাকি ওই গ্রন্থ দু'খানি। আর 'ভারতীয় সংস্কৃতি' না কি যেন মুণ্ডুমাথার সার-সত্য নাকি ওই দুটোর মধ্যেই ভরা আছে।……তা আছে তো থাকনা বাবা! পাঁচ সাত হাজার বছর ধরেই যখন রয়েছে, আরো কিছুদিন থাকতো চেপেচুপে। ……ঠিক এই বছরের এই গরমের ছুটির সময়টিতে সেই সার-সত্যকে টেনে বার করার দরকারটা কী ছিল?

এদিকে ব্যাপার হচ্ছে—লাটু গাঁট্টু জাম্বো শাম্বো ফুলটুসি মৌটুসিদের অনেকদিন ধরেই ক্লাশ করা অভ্যাস হয়ে হয়ে বেশ মুখস্থ হয়ে এসেছে। তা তাদের ভয় নেই। যদিও ফুলটুসির মত কারো নয়। ছোটমামার ওই মেয়েখানি যে কী ওস্তাদ! উঃ! একটা প্রশ্নেরও উত্তর ভুল হয়না।

যেই দাদু এই ঝিরঝিরে বাতাসেও হাতপাখা নাড়তে নাড়তে প্রশ্ন করে উঠলেন, "শরশয্যায় শুয়ে ভীষ্ম যখন জল খেতে চাইলেন, কে তাঁকে জল খাওয়ালো? আর কী ভাবে? বল কে বলতে পারিস।"

অমনি কি না ওস্তাদটি বলে উঠল, "খাইয়েছিলেন অর্জুন, আর জল এনেছিলেন মাটিতে বাণ বিঁধে বিঁধে পাতাল ফুঁড়ে।"

এতো শক্ত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ রাখার তোর দরকার কি রে পুঁটকে মেয়ে?

তা' বুটুন বোকার মত চুপ করে বসে না থেকে তাড়াতাড়ি বলে

উঠেছিল, "তার মানে চটপট একটা টিউবওয়েল বানিয়ে ফেলেছিলেন আর কি!"

মন্দ কি বলেছিল, কিন্তু এই শুনে দাত্বর কী হা হা হাসি।

দাত্ব হাসলে সবাই হাসবে এটাই স্বাভাবিক, কাজেই চলল কিছুক্ষণ, হি হি, খুক খুক খিল খিল।...তাতেও আশা মিটলনা, দাত্ব আবার হাঁক পাড়লেন, "ও রুবি, রুবি শোন শোন, তোর এই ছেলে ভবিষ্যতে একখানা বড়দরের গবেষক হবে। ব্রেন খুব শার্প।"

মাও অমনি আহ্লাদে গলে গিয়ে বললেন, "দেখুন বাবা, আপনার নাতিটি কী নিধি!"

কেন, এসব বলার কী দরকার?

বললে হত না, 'রামায়ণ মহাভারতের ক্লাশ ট্লাশ তো আগে করোনি বাবা—'

গল্প শোনার আমোদটাই মাটি হয় বুটুনের।

বেশ ভাল লাগছে যুধিষ্ঠিরের 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ'-র গল্পটা, হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল সকালেই এর খেসারৎ দিতে হবে। ব্যস, মন মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

রোজ রোজ এই ব্যাপার। বুটুন তো প্রায় সকলের হাসির জোগানদার হয়ে উঠেছে।

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুটুন ঠিক করল, আজ আর সে ওই ক্লাশের দিকে নেই, ...'পেটব্যথা করছে' বলে শুয়ে থাকবে।......ভুল-ভাল বলে ফেলে শুধু সবাইয়ের হাসির খোরাক হওয়ার দরকারটা কী বুটুনের? যদিই বুটুন বলে থাকে ঘটোৎকচের মা গান্ধারী। তাতে এতো হাসির কী আছে? ......গান্ধারীর ছেলেপুলেগুলোই তো মহা বদ, বিচ্ছিরি। আর ঘটোৎকচ নামটা বিচ্ছিরি ছাড়া আর কী? শুনলে কি মনে হয় বেশ সভ্য ভব্য ভাল ছেলে? তবে বুটুন তো শুধু দুই আর দুইয়ে চার করেছে। অথচ

ওই নিয়ে কাল কিনা বাড়িতে সারাদিনই হাসির ঘটা।……মামার বাড়ির মজাটাই গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। গতকাল সন্ধ্যায় দাদু আবার বুটুনকেই বিশেষ করে, মানে বুটুনের দিকেই চশমার নীচে দিয়ে তাকিয়ে, দুষ্টু হেসে বলেছেন, "মন দিয়ে শুনবি, মনের মধ্যে গেঁথে ফেলবি, তা হলে আর কেউ তোকে নিয়ে হাসাহাসি করবার অপারচুনিটি পাবে না।"

কী দয়া!

আহা! তার থেকে এই গরমের ছুটিটায় তোমার সাধের ক্লাশটি তুলে রাখোনা বাবা! বুটুন মালদহের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে রেলগাড়িতে উঠে বসুক, তারপরই খুলো আবার।……যাক, মনের কথা তো আর মুখে বলা যায় না। তাই বুটুন খুবই মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছিল, মনের মধ্যে যেন গেঁথেও ফেলেছিল কত কি। কিন্তু সকাল বেলা উঠে টের পেল মন একদম ফর্সা। ধোবাবাড়ির কাপড়ের মত ফর্সা! কাল যে কিসের উপাখ্যান শুনেছে, তাই মোটে মনে করতে পারল না।

কাজেই বুটুন এই ফন্দীটা ঠিক করে ফেলল।

পেটব্যথা করবে বুটুনের, খুব পেটব্যথা করবে।

কিন্তু কখন করবে?

একেবারে সকাল বেলা করলে তো অন্য বিপদ। ব্রেকফাস্টের আসরে প্রবেশ নাস্তি ঘটবে। বুটুনের মা আবার যা নির্দয়! একটু কিছু হলেই আগে খাওয়া বন্ধ।

নাঃ, এখন বলা চলবেনা।

কাল আবার দেখে রেখেছে দিদিমা রসপুলি বানাচ্ছিলেন সকালের জন্যে। ওটা নাকি বাসি হলেই মজে ভাল। তাছাড়া……মেজমামীর ডিপার্টমেণ্টের অবদানও তো কম লোভনীয় নয়! মেজমামার আবার পোল্ট্রির শখ, রোজ একচুপড়ি ভর্তি ডিম এসে যায় রান্নাঘরের দরজায়।……গরম ডিমভাজার সঙ্গে ঘীয়ে ভাজা মুড়ি। আহা! একমাত্র মামাবাড়িতেই এই খাদ্যের চলন দেখতে পায় বুটুন।

কই, তাদের নিজেদের বাড়িতেও তো হয়না।

মুড়ি খেতে হলেই তো সেই তেল-নুন মাখা। ঘীয়ে ভাজা মুড়ি যে কী জিনিস!

মাকে বললে, মা বলবে, 'তেমন মুড়ি এখানে কলকাতায় কোথায়? আর সেরকম খাঁটি গাওয়া ঘী!'

বুটুন বোঝে, আছে সবই, নেই শুধু ইচ্ছে। তাই ওকথা তুললে মা বলে, "থাম বাবা, চিরকাল যেমন টোস্ট, ডিমসেদ্ধ খাস তাই খা।"

যাক গে, আজ ঘুম থেকে উঠেই বুটুন জানলা দিয়ে দেখতে পেয়েছে, মুরগীর ঘরের কাজ করার ছেলেটা প্লাস্টিকের একটা চুপড়ি ভর্তি ডিম নিয়ে আসছে, অতএব এখন পেটব্যথার কথা তোলা পাগলের কাজ।

কথা তুলল—ডিমের পরোটা, ঘীয়ে ভাজা মুড়ি আর রসবড়া ঠেসে পেটটি নিটোল করার পর।

সঙ্গে সঙ্গেই কথা চাউর।

বুটুন আজ বারান্দায় এসে বসতে পারবেনা, ঘরে শুয়ে আছে, দারুণ পেটব্যথা।

তা পেটব্যথা তো পেটব্যথা, থাকুকনা বাবা ঘণ্টা দুই শুয়ে, ফাঁড়াটা কেটে গেলে উঠে পড়বে। তা নয়, হৈ হৈ করে সবাই ছুটে এলেন, 'সে কী? সে কী? এই যে দেখলাম খাচ্ছে সবাইয়ের সঙ্গে। হঠাৎ কী হলো? কী হয়েছে বুটুন? কি রকম কষ্ট হচ্ছে?'

কেন রে বাবা, বুটুন কি একটা রাজা মহারাজা না মন্ত্রী টন্ত্রী? তাই একটু কিছু হলেই সবাই হাঁ হাঁ করে ছুটে আসবে? আর জিগ্যেস করতে শুরু করবে, 'খাবারের মধ্যে কিছু পড়ে-টড়ে নি তো? ফুড পয়জন হবেনা তো?'

এখন মনে হল বুটুনের, পেট না বলে, মাথাব্যথা বললেই ভাল হতো। তাতে প্রেস্টিজ থাকতো। কিন্তু কী আর করা? বলা তো হয়েই গেছে। তার শাস্তিস্বরূপ ছোটমামা তেড়ে এসে দুটো কিসের যেন ট্যাবলেট খাইয়ে গেলেন, বড়মামী তাঁর হোমিও বিদ্যের একটু নমুনা দেখিয়ে গেলেন গোটা

ছয়েক হোমিও দানা বুটুনের হাঁ করা মুখে ফেলে দিয়ে, আর দিদিমা ওসবে গ্রাহ্য না দিয়ে আধকাপ যোয়ানের জল গিলিয়ে গেলেন।

কিন্তু এতেই কি রেহাই হল?

দাদু এলেন চটি ফট্‌ফটিয়ে, এবং একটি মোক্ষম ওষুধ বাৎলালেন। "পেটব্যথার এক মাত্র ওষুধ হচ্ছে মনকে অন্যমনস্ক রাখা, বুঝলি বুটুন। যতক্ষণ তুই বিছানায় পড়ে পেটব্যথা পেটব্যথা চিন্তা করবি, ততক্ষণ ও ব্যথা তোর পেটকে ছাড়বেনা। আয় উঠে আয়, চটপট চলে আয় ক্লাশে। আজকে আর অন্য কারুর পড়া ধরা নয়, শুধু তোর। চল চল। আমি কোশ্চেন করবো আর তুই উত্তুর ভাববি, ও তোর ব্যথা-ট্যাথা কোথায় ডানামেলে উড়ে যাবে। আয় আয়।"

দাদুর চিকিৎসা, এতো আর অমান্য করা যায়না।

অগত্যাই উঠে আসতে হল বুটুনকে।

দাদু ব্যাপারটা সকলকে বুঝিয়ে দিলেন।

"সব্বাই চুপচাপ থাকো, আজ শুধুই বুটুনের ক্লাশ। খবরদার, উত্তুর একটু ভুল-ভাল হলেও কেউ হাসবেনা। আজ বুটুনের পেটব্যথা।"

হাসতে বারণ। তবুও ভাল। সকলের ওই হাসিটাই তো মারাত্মক মর্মান্তিক।......বুটুন চৌকিতে উঠে বসে, দেয়ালের ধার ঘেঁসে। যাতে দেয়ালে মাথা হেলিয়ে অসুখ-অসুখ ভাবে বসা যায়। কিন্তু কঠোর-প্রাণ দাদু সে দিকে চক্ষুপাত মাত্র না করে বসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে ওঠেন, "কাল কিসের কাহিনী বলা হয়েছিল রে?"

হায় ভগবান! সেইটাই তো ধোবার বাড়ির জামার মত ফর্সা হয়ে গেছে। কিন্তু ফট্ করে জাম্বো বলে উঠল, "লক্ষণের শক্তিশেল, দাদু।"

রাগে হাড় জ্বলে বুটুনের। মেজমামার এই ছোট ছেলেটাও কম ধুরন্ধর নয়। এক ফোঁটা ছেলে, ক্লাশ টুতে পড়ে, সারাদিন শুধু একটা ইজের পরে ঘুরে বেড়ায়, তার এতো স্মৃতিশক্তি ফলাবার দরকার? অবশ্য বুটুনের সুবিধেই হলো। তা দাদু জাম্বোকে বকে উঠলেন, "অ্যাই, বলেছিনা আজ

সবাই চুপ থাকবে। আজ শুধু বুটুন। এটা বুটুনের শুধু পড়া ধরা নয়, ট্রীটমেন্টও। অন্তমনস্ক থাকা দরকার বুটুনের। মানে পেটের ব্যাপারে অন্তমনস্ক। যাক··· এখন বুটুন বলুক, শক্তিশেলে লক্ষণের মৃত্যু ঘটলে তো গন্ধমাদন পর্বত থেকে 'বিশল্যকরণী' আর 'মৃতসঞ্জীবনী' লতা আনবার কথা হল, তা গেল কে? যে ওইসব ওষধি লতা খুঁজতে দেরী হবে বলে পুরো গন্ধমাদন পর্বতটাই উপড়ে মাথায় করে একলাফে চলে এল, কে সে?

গল্পটা আবার মনে করিয়ে দিয়েই প্রশ্নটা করলেন দাদু।

এ প্রশ্নটা বুটুনের খুব সোজা লাগলো।

খুবই সোজা।

ভীম ছাড়া আর কার গায়ে এমন ভয়ানক জোর হবে? ভীমই তো না বকরাক্ষসকে মারার সময় বিশাল বিশাল গাছগুলোকে উপড়ে ডাণ্ডা বানিয়ে বকরাক্ষসকে ঠাণ্ডা করে ছেড়েছিলেন।··· এ গল্পটা বুটুন ছোটবেলা থেকে অনেকবার শুনেছে—ছোটকাকার কাছে, বড়দির কাছে, ঠাকুমার কাছেও।

তাই বুটুন চটপট উত্তর দিয়ে ফেলে, "এ আর কে জানে না? ভীম। ভীম।"

বুটুনের হঠাৎ মনে হল খুক্ খুক্ করে কে যেন হাসল। ওই ফুলটুসিটা না?······নাঃ। মিথ্যে দোষারোপ করছে ওকে বুটুন, ও হাসছে না, কাসছে

তা কাসবেনা? খুব কাঁচা আম খাও। হুঁঃ! একি বুটুনের হজম শক্তি? যে একগাড়ি কাঁচাআম খেলেও, কিচ্ছুটি হবেনা।···

জবাব শুনে দাদু বলে উঠলেন, "জীতা রও। প্রায় কাছাকাছি এসেছে। দুজনেই তো পবন-নন্দন। ভীম আর হনুমান।"

এইরে। ইস। ভুল হয়ে গেল তো।

মনে মনে জিভ কাটল বুটুন—হনুমান। সত্যিই তো, হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়নের ছবি তো দেখেছে সে ছোটদের রামায়ণে।

যাক, দাদু বললেন, "আচ্ছা, এবার বলো তো শূর্পনখার নাক-কান কেটে দিয়েছিল কে?"

বুটুন তখন দেখেছে বুদ্ধি খাটিয়ে দেখলে কাছাকাছি আসা যায়। তবে তো বেশী বুদ্ধি খাটালে কারেক্ট হবেই। তাই বুদ্ধি খাটিয়ে দেখল বুটুন, যে নিষ্ঠুর ব্যক্তিটি জটায়ুর পক্ষ ছেদ করেছিল, এ তার কাজ ছাড়া না হয়ে যায় না।

'জটায়ুবধ যাত্রা' এই সেদিন দেখেছে বুটুন। পিসিমাদের সঙ্গে। তাই মৃদু হাসির সঙ্গে বলল, "রাবণ। আর কে? দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত বিংশতি লোচন রাবণ রাজা মশাই!"

দাদু ঠিক এই সময় তাড়াতাড়ি হাতপাখাটা তুলে নিয়ে মুখের সামনে ধরে বললেন, "উঃ কী মাছি!"

ওদিকে ফুলটুসিটা তো কেসেই চলেছিল, আবার আরো সবাইও কাসতে শুরু করেছে। তার মানে কাঁচা আমের এফেক্ট। তার মানে সকলেই স্বাস্থ্যে কাঁচা।

দাদু বললেন, "রাবণ। ওঃ। আচ্ছা···তা হ্যাঁরে পেটব্যথা একটু কমছে?"

বুটুন মাথাটাকে ওপর নীচে করল।

"ঠিক আছে, বল দেখি—পঞ্চপাণ্ডবের নাম কি? মানে যুধিষ্ঠিরদের পাঁচ ভাইয়ের?"

যাক আজ তবু দাদু বেশ সহজ সহজ প্রশ্নগুলো করছেন। বুটন চটপট বলে উঠল, "যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ভরত শত্রুঘ্ন।"

আঃ। দাদুও কি কাঁচা আম খেয়েছেন?

তিনিও যে জোর কাসি শুরু করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সবাইও কাসতে লেগে গেছে। যাক, এরা তবু স্বাস্থ্যবিধিটা মানে। কাসি এসে গেলে যে মুখে হাতচাপা দিয়ে কাসতে হয় তা জানে।

দাদু কাসি থামিয়ে বলে ওঠেন, "আজ বুটুন যে রকম চটপট জবাব দিতে পারছে তাতে আশা হচ্ছে এবার থেকে এই রামায়ণ মহাভারতের ক্লাশে বুটুন ফার্স্ট হবে। যাক, আর তিনটি প্রশ্ন করছি, চটপট জবাব চাই। বলতো দশরথের কয় রানী?"

বুটুন বুক ফুলিয়ে বলে উঠল "কেন, তিন রানী।"

—গুড। তা তাঁদের নাম কি কি?

বুটুনের মধ্যে এখন অগাধ আত্মবিশ্বাস। বুটুন অবহেলায় বলে, "কৈকেয়ী, কুঁজী আর মন্দোদরী।"

ব্যস!

তিন প্রশ্নের শেষ প্রশ্নটি আর করা হয়না দাদুর।

হঠাৎ প্রবল একটা হাস্যরোলে হট্টগোল ওঠে। সব কাসিগুলোই হাসি হয়ে যায়। এমন কি দাদুও গলা খুলে হা-হা করে ওঠেন।

"কী বললি? দশরথের তিন রানী কৈকেয়ী কুঁজী আর মন্দোদরী। ওঃ হো হো! ও রুবি, শুনে যা, শুনে যা।"

আবার সেই রুবি।

হতে পারে তোমার সবেধন নীলমণি একমাত্র মেয়ে। তাই বলে সব ব্যাপারেই তাকে ডাকতে হবে?……না হয় এখন বুটুনের উত্তরটা ঠিক হয়নি। কিন্তু যখন ঠিক ঠিক হচ্ছিল? তখন তো কই—

হঠাৎ একটা সন্দেহে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে বুটুনের। ঠিক ঠিক কি হচ্ছিল? বোধহয় না। ভুল-ভালই হচ্ছিল বোধহয়। তাই এতোক্ষণ সবাই মিলে মুখে হাতচাপা দিয়ে হাসির ধূম। কাসি নয়, তাহলে আসলে হাসি চাপার ছল। রাগে দুঃখে অপমানে বুটুনের কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল।

আর বুটুন! "সব সময় 'রুবি রুবি' কেন?" —বলে চৌকি থেকে লাফিয়ে নেমে বাঁই বাঁই করে সোজা আমবাগানের একেবারে গভীর ভিতরে গিয়ে হাঁপ ছাড়ল।

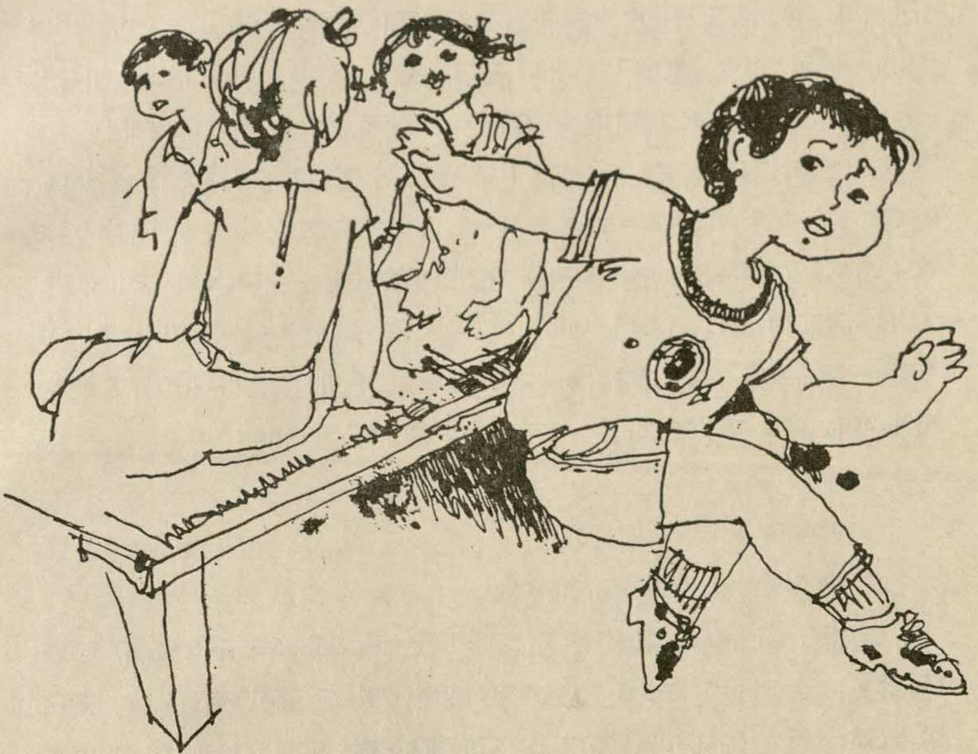
রোসো, আজই সে কলকাতায় চলে যাবে।

মার সাধের বাপের বাড়িতে মা থাকুক গে যাক, বুটুন ঠিক পালাবে। কেন? ভয়টা কি? তার কাছে তো বেশ কয়েকটা টাকা আছে। রেলভাড়া হয়ে যাবে।

যাই হোক, এখন তো একটু বসা যাক।

জায়গাটা ভারী চমৎকার। ছায়া ছায়া হাওয়া হাওয়া।

বসে পড়ে বেশ ভাল লাগতে লাগল বুটুনের। আমবাগানে আম কুড়োতেই আসা হয়। এমন ঝির-ঝির বাতাস গায়ে মেখে বসে থাকা তো হয় না।



...চৌকী থেকে লাফিয়ে নেমে বাঁই বাঁই করে সোজা...

চারিদিকটা তাকিয়ে দেখে বুটুনের মনে হল এই জায়গাটা ঠিক যেন তপোবন! কেমন গোল হয়ে গাছের সারি, মাঝখানের ছোট্ট খানিকটা জায়গা কে যেন সাফ করে রেখে গেছে!......ঘন ছায়া সমন্বিত এই তপোবনে বসে বুটুনের মনে একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হল।

এখানে বসে তপস্যা করবে বুটুন।

হ্যাঁ, জোর তপস্যা।

রামায়ণ মহাভারতের যত কাহিনী, তার মধ্যে তো দেখেছে কেবল অভিশাপ, তপস্যা, আর বর পাওয়া। আসলে বর পেয়ে পেয়েই তো সবাই যত বীর যোদ্ধা, শক্তিশালী, প্রতাপশালী।······তবে এইটা বুঝে নিয়েছে বুটুন, স্বর্গে মর্তে পাতালে কোথাও ক্ষমা বলে কিছু নেই। ইয়া ইয়া সব মুনি ঋষি, যাঁদেরকে ভক্তি করে চলাই মানুষের নিয়ম, তাঁরা কি না, কথায় কথায় অভিসম্পাত দিচ্ছেন। কে কখন গুরুর একটু ডাক শুনতে পায়নি, কে কোন্ সময় না বুঝে কী একটু দোষ করে বসল, ব্যস! লাগাও শাপ।······ উদাহরণগুলো মনে পড়ছে না বটে (মনেই যদি পড়বে সব ঠিক ঠিক সময়ে, তাহলে বুটুনেরই বা আজ এমন অভিশপ্ত অবস্থা ঘটবে কেন?) তবে এটা মনে পড়ছে তো কথায় কথায় অভিশাপের ছড়াছড়ি। মুনি ঋষি তো বটেই, স্বর্গের দেবদেবীরাই বা কী এমন মহৎ? এতটুকু কিছু দোষ-ঘাট হল কি অমনি—'যা মর্তে গিয়ে কুষ্ঠ ভিখিরি হয়ে জন্মাগে যা'। 'যা পৃথিবীতে গিয়ে সাপ ব্যাঙ হয়ে জন্মাগে যা।' কত কতই যে আছে এসব!

একমাত্র শান্তি তপস্যায়।

মানে তপস্যা শেষে বরলাভে।

রাবণ যে অতো প্রতাপশালী হয়েছিল, সে তো ওই মহাদেবের বরের জোরেই। কংস-টংস আরও কত কত জনেই তো দোহাত্তা বর পেয়ে পেয়ে যা ইচ্ছে তাই করে বেড়িয়েছে। কষ্টের মধ্যে শুধু একটু তপস্যা! সে এমন কিছু না।

তপস্যাই হচ্ছে বেস্ট। আর সেটা তো আর কিছুই নয়, শুধু মন দিয়ে ডাকা। ফুল ফল চিনি বাতাসা কিছুই লাগবেনা। শুধু ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে থাকা। তপস্যার শেষে যখন শিব বর দেবার জন্যে এসে দাঁড়াবেন, তখন বুটুন বলবে, "দাদুর মাথা থেকে এই রামায়ণ মহাভারতের ভূতটা নামিয়ে দাও ঠাকুর। এই আমার প্রার্থনা।"

নাঃ—আর দেরী করা নয়।

আত্মগোপন করে বসে পড়া যাক।

দুটো পাশাপাশি আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে চোখ বুজে বসে পড়ল বুটুন। একমনে এক ধ্যানে ভেবে চলেছে শিবঠাকুরকে, ডেকে চলেছে শিবঠাকুরকে।

দিন গেল রাত গেল, পরদিন সকাল গেল, কত কত দিন চলে গেল, বুটুন ঠায় বসে আছে। চোখবুজে ধ্যানমগ্ন হয়ে।······হঠাৎ একদিন এক সময় বুটুনের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, কে যেন বলে উঠল, "বুটুন তুমি আমার পরম ভক্ত। তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। এখন বল তোমার কী প্রার্থনা? কী বর চাও।"

বুটুন চোখ তাকিয়ে দেখল সামনে জটাজুটধারী মহাদেব। মুখে মৃদু হাসি। এ মূর্তি আর কার অচেনা?

বুটুন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল, খেয়াল এলোনা একটা প্রণাম করা উচিত।

তিনি আবার বলে উঠলেন, "কই বল? বল বৎস, চটপট বল কী বর চাও?"

মহাদেবের দাড়ি জটা বাঘছাল সব দুলে উঠল ছট্‌ফটানিতে।

বুটুনের মনে পড়ল তপস্যার আগে সে ঠিক করেছিল বর পেলে বর চাইবে দাদুর মাথা থেকে ওই 'ভারতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের' ভূত নামুক। কিন্তু এখন মনে হল তাই বা কেন? বরই যখন পাচ্ছি তখন এটা চাইনা কেন—ফুলটুসির থেকেও স্মৃতিশক্তি বেড়ে যাক আমার। সক্কলের থেকে বেশী। দাদু যেই মাত্র প্রশ্ন করবেন, সেই মাত্র পটাপট উত্তর দিয়ে দেব। সবাই হাঁ হয়ে যাবে। আর তখন হেসে বলব, 'তোরা বুঝি ভাবতিস আমি সত্যি ওই রকম ভুল-ভাল বলি? আমি তো তোদের মজা পাবার জন্যে ইচ্ছে করে উল্টোপাল্টা বলতাম।' কী মজাই হবে তাহলে, তাছাড়া স্মৃতিশক্তি বেড়ে গেলে স্কুলেও—

—কইরে বল! আমার কাজ নেই?

শিব ঠাকুরের ব্যস্ত স্বরে বুটুনের চিন্তাভঙ্গ হয়।

—এই যে বলছি······

বলেও বুটুন একটু থামে······

জীবনে তো এই একবার মাত্র এই মহা সুযোগ লাভ হয়েছে।··· আবার কবে তপস্যা করে উঠতে পারবে কে জানে। ওর থেকে আরো ভালো কিছু যদি চেয়ে নেওয়া যায়?······আরো ভাল—আরো ভালো—আচ্ছা যদি বলা যায়, জীবনে কক্ষনো বইখাতা না ছুঁয়েও আমি যেন এম. এ. টেম. এ. সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে হয়ে পাশ করে চলি। তাই ভাল। বলি—প্রভু—

কিন্তু তাহলে দাদুর এই ক্লাশের ব্যবস্থাটা কী হবে?

আচ্ছা, পুরাণের ওই কাহিনীগুলোয় তো প্রায়ই দেখা যায় যাঁরা বর দেন তিনটে করে বর দেন। তবে কেন শিবঠাকুর বুটুনকে মাত্র একটা বর দিয়ে পালাবার তাল করছেন? বুটুন ছেলেমানুষ বলে তাকে ঠকাবে তুমি ঠাকুর হয়ে?

—বৎস বুটুন। এই শেষবারের মত বলছি কী বর চাও?

বুটুন রাগ রাগ গলায় বলে, "বর দিলে তো তিনটে দিতে হয়—"

হঠাৎ চোখের সামনে থেকে সেই জটাজুট বাঘছাল ত্রিশূল ডম্বরু অন্তর্হিত হয়ে যায়, আর বুটুনের কানে একটা ঘ্যাচ করে টান পড়ে—কী ব্যাপার? ত্রিশূলের খোঁচা লাগলো না কি?

চোখটা রগড়ে নিয়ে কানে হাত দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল বুটুনের একটি কান দাদুর আদরের রুবির আঙুলের পাকের মধ্যে!

কানটা ছাড়িয়ে নিতে গেল বুটুন, পারল না।

মা বলে উঠল, "পাজী শয়তান ছেলে, পেটব্যথার ছুতো করে তুমি এইখানে এসে আরো কাঁচা আম পেট বোঝাই করে বসে বসে ঘুম মারছো?

বেলা ত্বটো বাজে, বাড়িস্থদ্ধু সবাই খেতে বসতে পায়নি, তোমায় খুঁজে খুঁজে অস্থির হচ্ছে। চলো, দেখ আজ কী শাস্তি করি তোমার!"



মা বলে উঠল, "পাজী শয়তান ছেলে..."

বেলা ত্বটো বেজে গেছে!
কেউ খায়নি, বসে আছে!

বুটুন হাঁ করে তাকায়। এটা কোন্ দিনের বেলা ত্বটো? বুটুন তো কতদিন ধরে তপস্যা করছিল। মা না হয় ভাবছে ঘুম, কিন্তু আসলে তো তা নয়।

বুটুন বলে উঠল, "কী বার আজ?"

—কী বার? কেন এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি তোমার, বিচ্ছু ছেলে! জানো আজ সোমবার? কেন বার নিয়ে কী হবে? অফিস যাবে? চল শীগগির খেতে।

বুটুন হঠাৎ অনুভব করে শুধু কানেই পাক পড়ছে না, তার পেটের মধ্যে খিদেয় পাক দিচ্ছে। তবু বুটুন হ্যাঁচ করে মার হাত থেকে কানটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে ওঠে, "খাবনা আমি, যাও। তুমি আমার যা সর্বনাশ করলে!"

হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে ধাড়ি ছেলেটা!

উঃ! মা আর দু তিন সেকেণ্ড দেরী করতে পারল না? তাহলে অন্তত একটা বরও চেয়ে ফেলা যেত। কিন্তু শুধু মায়ের উপর রাগ করলেই বা চলবে কেন? নিজের উপরেও দারুণ রাগ হচ্ছে বুটুনের। বেশী কিছুর বাসনা না করে বুটুন যদি ওই স্মৃতিশক্তিটাই প্রার্থনা করে নিতো গো! কত কীই হতে পারতো তা থেকে। জীবনে আর কী কখনো শিবঠাকুর এসে দাঁড়াবেন তার সামনে? বর দেবার জন্যে?

কৃতজ্ঞতা নেই? অ্যাঁ—

সুতি গেঞ্জির ওপর গরম গেঞ্জি। গরম গেঞ্জির ওপর ফুলহাতা পুলওভার, পুলওভারের ওপর গরম কোট, গরম কোটের ওপর লম্বাঝুল ওভারকোট, ওভারকোটের আড়ালে মিলিটারি-মার্কা কম্বুলে পায়জামা, কম্বুলে পায়জামার অন্তরালে—সূতি পায়জামা, পায়জামাদের নীচে 'অলউল' ফুলমোজা, ফুলমোজার খানিকটা চাপান দিয়ে গামবুট।……ওদিকে, মানে ঊর্ধ্বদিকে হাতে দস্তানা, গলায় ডবলবুনুনি মাফলার (নিত্যগোপালের ভাষায়



নিত্যগোপাল

অবশ্য কম্‌ফোর্টার), মাথায় কানঢাকা টুপি, নাকের জল সামলাতে পকেটে এক জোড়া রুমাল।

আত্মরক্ষার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে বেলা দুটো বাজা মাত্রই বৈকালিক ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন নিত্যগোপাল। শীতের চারমাস এইটাই প্রোগ্রাম তাঁর।……নিত্যগোপালের হিসেবে শীত ঋতুটা চতুর্মাসিকই। মার্চ পড়লে এই সাজসজ্জা থেকে দু'একটা কমান নিত্যগোপাল, এবং ভ্রমণের সময়টাও একটু পিছিয়ে দেন। তবে পশমবস্ত্র মুক্ত, কদাচ না।

কিন্তু নিত্যগোপাল কি কাশ্মীরে বাস করেন? নাকি দার্জিলিঙে? অথবা সিম্‌লে, শিলং, মুসৌরি পাহাড়? না না, সে সব কিছু না। নেহাৎই কলকাতার বাসিন্দা তিনি। ঢাকুরিয়া লেক-এর কাছাকাছি বাড়ি। কিন্তু কী করবেন? সর্দি যে তাঁর সঙ্গের সাথী। এতেও তো তার হাত থেকে রেহাই পান না। যখন তখন ফট্‌ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়।

নিত্যগোপাল আছেন, অথচ তাঁর সঙ্গে সর্দি নেই, কাসি নেই, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, টন্‌সিল ফোলা নেই, নাকের জল নেই, চোখে 'জল-জল-ভাব' নেই —এতো জ্ঞানে গোচরে মনে করতে পারেন না নিত্যগোপাল।

ছেলেবেলায় ঠাকুমা তাঁকে তুলোর জামা পরিয়ে মানুষ করতেন, আর সারাবছরই তিনি টুপি মোজা পরে থাকতেন এটা বেশ ভালই মনে আছে নিত্যগোপালের। কোনোদিন স্নান করেছেন বলে মনে পড়ে না।

কাজেই এইসব নিয়ম করতেই হয়েছে নিত্যগোপালকে! শরীরটাকে তো টিকিয়ে রাখতে হবে! কিন্তু একটানা নিয়ম ক'দিনই বা চলে? ভারী দুঃখিত হন নিত্যগোপাল প্রকৃতির অস্থিরপনায়। গরম কালের ব্যবস্থা ধাতস্থ হতে না হতেই তো এসে হাজির হবেন বর্ষা। তার মানে ঝড়-বৃষ্টি, মেঘলা, কাদা, রাস্তায় জল দাঁড়ানো, জোলো হাওয়া। তবে? তিনটি মাস ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকা ছাড়া উপায় কী? নিত্যগোপাল তাই এই শীতের চারমাস, যত পারেন রোদ্‌ খেয়ে খেয়ে হাড়ের মধ্যেকার শাঁসটাকে পর্যন্ত

শুকিয়ে খট্‌খটে করে রাখতে চান। তাঁর ঠাকুমা যেমন কাঁচা আমকে রোদে শুকিয়ে শুকিয়ে আমসি করে রাখতেন!

তাই—নিত্যগোপাল বোস

বৈকালিক ভ্রমণ হিসেবে এই বেলা দুটোকেই বেছে নিয়েছেন। এতে দুটি সুবিধে,—প্রথম, রোদটি থাকে চড়া, যাতে হাড় ভাজা-ভাজা হতে পারে। আর দ্বিতীয়, ফেরার সময়টাও রোদ-রোদ থাকে। পাঁচটা বাজা মানেই তো হিম পড়তে শুরু হওয়া।

তাছাড়া—এ সময় লেক-এর ধারটি থাকে নির্জন-নির্জন, হুট-হাট ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে কেউ ছায়া ফেলে ফেলে রোদে বিঘ্ন ঘটাতে আসেনা।

বাড়িতে নিত্যগোপালের ঘরটি সবসময় হীটার জ্বেলে গরম রাখা হয়, এসেই সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন তিনি, সকালে রোদ ওঠার আগে আর সে ঘর থেকে বেরোন না। বেরোবেন কি, ঘরে ঢোকা মানে তো শুধু ঘরে ঢোকাই নয়, বিছানার মধ্যে ঢুকে পড়া তো! রোদে গরম করে রাখানো তিন-চার খানা লেপ-কম্বলের নীচে নিজেকে চালান করে ফেলেন।

রাত্রে ওই বিছানার ধারেই ছোট টেবিল এনে খেতে দেওয়া হয় নিত্যগোপালকে, টেবিলেই বাটির গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেলেন। হাত ধোয়ার প্রশ্ন নেই, গ্লাভস-পরা হাতেই চামচ দিয়ে তুলে তুলে খান। রান্নার লোক কেষ্ট রুটিগুলো সেঁকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংসর ঝোলে ডুবিয়ে রাখে, খাবার সময় গরম করে দেয়।…শীতের চারমাস এই পদ্ধতি নিত্যগোপালের। মাংসটাও রোজ চাই, ওতে নাকি ঠাণ্ডার ধাত কমে। কিন্তু এমনি তাঁর স্বাস্থ্য-ভাগ্য যে এতো সাবধানতাতেও নিজেকে শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে পারেন না।

আর শুধু শীতকালই বা কেন, সারা বছরই তো গলা ঘড়ঘড়, নাক সড়সড়, কান কট্‌কট, দাঁত কন্‌কন। অথচ এমনি নিষ্ঠুর তাঁর বাড়ির লোকরা, বলে কিনা—"ওসব কর্তার বাতিক!"

আর ওই চার বছরের নাতিটা?

নামেও বিচ্ছু, কাজেও বিচ্ছু। হেসে হেসে বলে—"দাদু আইসক্রীম

খাবে? দাদু, তুমি ফ্রীজের জল খাওনা কেন?”······আর এই বেড়াতে বেরোবার সময়? দেখতে পেলেই হি হি করে বলে ওঠে, “দাদু, তোমায় ঠিক ভাল্লুকের মতন দেখাচ্ছে। দাদু, তোমায় ভোঁদড়ের মত দেখাচ্ছে।”

ওর কথা অবশ্য কেয়ার করবার কথা নয়, তবু বেরোবার সময় ওর সামনে না পড়লেই বাঁচেন নিত্যগোপাল। কিন্তু ক’দিনই বা বাঁচতে পান? ওতো আর দুপুরে ঘুমোয় না! সকালবেলাই তো স্কুলের বালাই মিটে যায়, সারা দুপুর ট্রাইসিকল চড়ে বাড়ি পয়নট্ট করে বেড়ায়।

আজকেও নিত্যগোপাল যেই সাজগোজ সমাপ্ত করে ঘর থেকে বেরোচ্ছেন, বারান্দার কোনদিক থেকে যেন হুড়মুড়িয়ে সাইকেল নিয়ে সামনে এসে পড়ে বলে উঠল, “হি হি হি, দাদু তোমায় ঠিক—বুদ্ধুভুতুমের মতন দেখাচ্ছে।”

হলেই বা নাতি, কথা শুনে আহ্লাদ পেলেন না নিত্যগোপাল, রেগেমেগে বললেন, “আর তোমায়? তোমায় দেখাচ্ছে একটি তালপাতার সেপাইয়ের মত, বুঝলে? ঠিক তালপাতার সেপাইটি!······আচ্ছা—এই হাড়কাঁপানো শীতে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াবার মজা টের পাবে।”

বলেই গামবুট পরা পায়ে দম দম করে বেরিয়ে পড়লেন। রোদটাকে তো ধরতে হবে গিয়ে।···নিত্যগোপালের বাড়ি থেকে লেক খুব কাছে হলেও, এসে পৌঁছেই একটা বেঞ্চে বসে পড়ে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন, যেমন রোজ থাকেন। পোষাকে আর নিজস্ব ওজনে ভারটি তো কম নয়, টেনে তো আনতে হয়েছে!

এ সময় খালি বেঞ্চ পাওয়া যায়। আস্তটাই দখল করে বসে থাকেন নিত্যগোপাল বোস। একটু বিশ্রাম হয়ে গেলে মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গুণে গুণে বত্রিশটি হাঁচি হাঁচেন। নিত্যগোপালের এটি নিত্য অভ্যাস। এ নাকি একটা ব্যায়াম, এতে ফুসফুস ভাল থাকে।

হাঁচির পর চারবার চারমুখো হয়ে একশো ফুট করে হাঁটেন, কারণ শরীরের সব দিকে সমান পরিমাণে রোদ লাগানো দরকার। নচেৎ ফট্ করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।



হেসে হেসে বলে—“দাদু আইসক্রীম খাবে?”

আজও হাঁচির পর হাঁটতে শুরু করেছেন। কিন্তু আজ অযাত্রা—পূর্ব-দক্ষিণটি হওয়া মাত্রই, কোথা থেকে ছুটো ফচ্‌কে ছেলে সামনে এসে হাজির। তোরা কী করতে এসময় এখানে রে বাপু? একটাও ফেরিওলা এসেছে এখন? তবে? তা এসেছিস এসেছিস, নিজেদের পথে যা! তা নয়, পথ আগলে দাঁড়িয়ে হি হি করে বলে উঠল কিনা, "ও এস্কিমো দাছু। এই গ্রীনল্যাণ্ড থেকে এসে নামলেন, না—সেখানে যাচ্ছেন?"

উঃ! কী-সব ছেলেপুলে হয়েছে আজকাল!

পা গুণে গুণে ফুট মাপেন, গোণার ভুল হয়ে গেল। রেগে বলে উঠলেন, "গ্রীনল্যাণ্ড কেন, উত্তর মেরুতে যাচ্ছি। তোমরা যাবে?"

"না দাছু। অতো পোষাক কেনার পয়সা নেই"—বলে হি হি করে চলে যায় ছেলে ছুটো।……মেজাজ খারাপ হয়ে গেল নিত্যগোপালের। আটানব্বই ফুট পর্যন্ত হয়েছিল, না নিরেনব্বই ফুট তা' মনে পড়ল না। কি আর করা? গোঁজামিল করেই ভেবে নিলেন আটানব্বই। বরং বেশী হওয়া ভাল তো কম হওয়া ভাল নয়।……কিন্তু আজ অপয়া দিন।

যেই না ফিরে এসে 'নিত্যকর্মপদ্ধতি' অনুসারে গুণ-গুণ করে সুর ভাঁজতে বসেছেন, কোথা থেকে একটা নীল র‍্যাপার গায়ে দেওয়া মফস্বলি মত লোক এসে নিত্যগোপালের বেঞ্চেতেই চেপে বসল। যেন তল্লাটে আর বেঞ্চ নেই!

সুরভাঁজা তো আর মুগুরভাঁজা নয় যে, লোকের সামনে চালানো যাবে? থামিয়ে ফেলতে হলো, অথচ এটিও একটি ব্যায়াম। সুর ভাঁজলে স্বরনালী ক্লীয়ার থাকে, একথা বলেছিলেন নিত্যগোপালের বড় জামাইবাবু। তা' বাড়িতে তো হবার জো নেই। কোথা থেকে শুনতে পেয়ে বিচ্ছু পাড়া জানিয়ে হাততালি দিয়ে উঠ্‌বে "দাছু গান গাইছে! দাদু গান গাইছে!"

উঃ! ঘরে বাইরে বিঘ্ন।

মানুষ যে একটু নিজের মত থাকবে, তার উপায় নেই। দুটো জামা-কাপড় পরবেন,—চেয়ে নয়, চুরি করে নয়, নিজের পয়সায়, তাতেও ঠাট্টা সইতে হবে। মানুষ জাতটার স্বাধীনতার কী অভাব!

কৃতজ্ঞতা নেই? অ্যাঁ—

পাশের লোকটার দিকে কট্‌মট করে একবার তাকিয়ে নিত্যগোপাল বেঞ্চের এধারে সরে বসলেন। কিন্তু লোকটা কী মান-মর্যাদাহীন! এই স্পষ্ট অপমানেও লজ্জা না পেয়ে, একগাল হেসে বলে উঠল, "মেসোমশাইয়ের বুঝি খুব সর্দিকাসির ধাত?"



...মেসোমশাইয়ের বুঝি খুব সর্দিকাসির ধাত?

মেসোমশাই!

আদর কাড়াবার জায়গা পায়নি।

রাগে সাতটা জামা আর ছাল চামড়া রক্তমাংসর তলায় অবস্থিত হাড়টা

জ্বলে গেল নিত্যগোপালের। কড়া গলায় বলে উঠলেন, "আমার কী ধাত, সেটা জেনে আপনার কিছু দরকার আছে?"

'আপনি' তো বলতেই হবে।

আমলটা তো নিত্যগোপালদের নয় যে মফস্বলি মার্কা লোক দেখলে তুই তুমি করবেন। তা আপনি বললে কী হবে? ভঙ্গীটা তো মান্যের নয়।

লোকটা কিন্তু এতেও না দমে বলে উঠল, "মেসোমশাই কী রাগ করলেন? তবে থাক—"

নিত্যগোপালের ভুরুটা কুঁচকে যায়।

তবে থাক মানে?

বিরস গলায় সেই প্রশ্নটাই করেন। "মানে?"

লোকটা দুঃখু দুঃখু গলায় বলে, "মানে একটা ওষুধের কথা বলছিলাম। মোক্ষম টোট্‌কা। তা আপনি বিরক্ত হচ্ছেন।"

নিত্যগোপাল এখন একটু নরম হন।

—বিরক্ত হবো কেন? তবে হঠাৎ ওষুধের কথা? কিসের ওষুধ, কী বৃত্তান্ত?

—বৃত্তান্তের কিছু নেই। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর সর্বব্যাধিবিনাশক ওষুধ!...... ফুলপুরের ফকির গাজীর সেই টোট্‌কায় আপনার গিয়ে ভূভারতে যতরকম অসুখ আছে সব ঠাণ্ডা।

নিত্যগোপাল অবিশ্বাসের গলায় বলেন, "আমার অসুখ সারবার নয়।"

—ওইতো। আপনারা শহুরে লোক ভূত ভগবান দৈব অদৈব সবেতেই অবিশ্বাস। কিন্তু শাস্ত্রে কী বলেছে? বিশ্বাসে মিলায় হরি—ধ্রুব অতটুকু শিশু, শুধু বিশ্বাসের জোরে—তা আপনি যখন—

নিত্যগোপাল তাড়াতাড়ি বলেন, "আরে বাবা, তেমন কিছু শহুরে-সাহেব আমি নই। দরকারে পড়লে ভূত ভগবান পীর ফকির সবই মানি। তবে চিরজীবন তো দেখলাম। ওষুধের ওপরই আছি। কই, কিছুইতো—"

লোকটা হঠাৎ দুঃখভাব ছেড়ে উত্তেজিত হয়, "চিরজীবন ওষুধের ওপরই

আছেন? অথচ ফুলপুরের ফকির গাজীর ওষুধটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে ইচ্ছে হলনা? আশ্চর্য! শহরের লোকের তো এই—ডাক্তারের হাতে মরবে, তবু সাধু সন্তর হাতে বাঁচতে চাইবেনা।"

নিত্যগোপালও উত্তেজিত হন, "কী মুস্কিল। কে বলেছে বাঁচতে চাইনা? বাঁচবার জন্যেই ত' মরে যাচ্ছি। কিন্তু কোথায় আপনার সেই ফুলগাজীপুর আমি জানি? নামও তো শুনিনি কখনো।"

—ফুলগাজীপুর নয় মেসোমশাই, ফুলপুরের গাজী। একটু মন দিয়ে শুনবেন তো? আমার আবার এমন স্বভাব, কারো কষ্ট দেখলে চুপ করে থাকতে পারিনা।······এই তো সেবার, আমার এক মামা হাঁপানিতে ভুগে হাড়সার, টোটকা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, জোর করে ধরে নিয়ে ফকির গাজীর সামনে বসিয়ে দিলাম, ব্যস—হাঁপানির হাঁপ 'বাপ-বাপ' করে চলে গেল। এখন মামা ডনবৈঠক করছেন, দু'মনী বস্তা তুলছেন।

নিত্যগোপাল আরো উত্তেজিত হন। "শুধু সামনে গিয়ে বসতেই সেরে গেল?"

—প্রায় তাই। শুধু একটি শেকড় একটু পুড়িয়ে নাকের সামনে ধরলেন। ব্যস।

নিত্যগোপাল এখন হতাশ হতাশ ভাবে বললেন, "কিন্তু আমার তো হাঁপানি নয়। শুধু ঠাণ্ডা লাগার ধাত!"

—কী আশ্চর্য! আমি কি বলেছি শুধু হাঁপানি সারান? বললাম না, ভূভারতে যত ব্যাধি আছে—কলেরা বসন্ত টাইফয়েড টি-বি বাত ব্লাড-প্রেসার জ্বর ডিসেণ্ট্রী, লিভার পীলে, হাঁচি কাসি—

—বলছেন?

নিত্যগোপাল নিজেই এবার লোকটার কাছে সরে বসে বলে ওঠেন, "সত্যি সারে?"

—না হলে কি আমি আপনার কাছে বাজে কথা বলছি মেসোমশাই? আমার নিজের চোখে দেখা। এজন্মে তো বটেই, আগামী তিন জন্মের মতও

সর্দি-কাসির ধাত সেরে যাবে। এইতো গত সেপ্টেম্বরে আমার এক বন্ধুর বাবাকে নিয়ে গেলাম, শেকড়টি পুড়িয়ে নাকের কাছে আনতে যা দেরী। সর্দি-কাসি গলাব্যথা নাকের জল চোখের জল সব চোঁ করে ভেতর থেকে সড়াৎ করে বেরিয়ে এসে সোজা মাথার ব্রহ্মতালু ভেদ করে উঠে গেল।

নিত্যগোপাল করুণ মুখে বলেন, "তাঁর কি আর আমার মত এতো—"

পরোপকারী ভদ্রলোক টান্‌টান গলায় বলে ওঠেন, "আপনার মত? আপনার থেকে অনেক শোচনীয় অবস্থা ছিল তাঁর। তিনি না, মে-জুনেও ফুটন্ত জলে চান করতেন—"

—ওকথা আবার আমায় শোনাচ্ছেন কী?—নিত্যগোপাল বাধা দিয়ে বলেন, "সে তো আমিও করি।"

—আরও শুনুন। বর্ষার তিনমাস, আর শীতের চারমাস তিনি আদৌ চান করতেন না—

নিত্যগোপাল অধৈর্য গলায় বলেন, "সে তো আমিও করি না।"

—আহা, আরো শুনুন না—

লোকটা হাত নেড়ে বলে, "সারা বছর তিনি গরম জল খেতেন—"

নিত্যগোপাল দারুণ অধৈর্য হয়ে বলেন, "রানীগঞ্জে কয়লার গল্প। আমার বাড়িতে আমার জন্যে সর্বদা তুটো ফ্লাস্কভর্তি গরমজল মজুত থাকে, যাতে একবারও না—"

—দাঁড়াননা, এখনো শেষ হয়নি। তিনি না কি তাঁর ঘরের ভেন্টিলেটার তুটো কাঠ মেরে বুজিয়ে দিয়েছিলেন—

নিত্যগোপালের সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে যায়। প্রায় খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, "তিনি ভারী বাহাতুরী করেছিলেন। আমি তো সিমেণ্ট দিয়ে বুজিয়ে রেখেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো?"

কী হলো?

লোকটা আহ্লাদেভরা গলায় বলে, "এখন তিনি এই জানুয়ারিতেও স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, রোজ ভোরবেলা ঠাণ্ডাজলে চান

করছেন, রাতে খোলা বারান্দায় ঘুমোচ্ছেন, আইসক্রীম মালাই কুলপী খাচ্ছেন—"

—বুঝেছি! বুঝেছি। সর্বদা আইসব্যাগ মাথায় চাপিয়ে, ভিজে তোয়ালে বুকে বেঁধে বেড়াচ্ছেন তিনি। কিন্তু সেই ফুলপুরটা কোথায় সেটাই বলুন?

—আমায় 'আপনি' বলবেননা মেসোমশাই, আমি আপনার ছেলের বয়সী।

—আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তা সেই ফকিরের ঠিকানাটা—

—ঠিকানার কিছু নেই। স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন। সেখান থেকেই রুগীর আর রুগীর আত্মীয়ের লাইন পড়ে গেছে। বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনা নিজের চোখে দেখা। একটা একপেয়ে লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফকির গাজীর কাছে গেল, আর পাঁচমিনিট পরে লাফাতে লাফাতে ফিরল—

—বুঝছি, সবই বুঝতে পারছি। বিশ্বাসও করছি। নিশ্চয় কোনো অবতার এসেছেন। কিন্তু স্টেশনে যে নামবো, তা সেই স্টেশনটা কী?

—কী অদ্ভুত! বললাম না, ফুলপুরের ফকির গাজী। তা ফুলপুরে যেতে কি আপনি কাঁটাপুরে নামবেন?······কলকাতায় আসতে কানপুর?······ এইতো গত অগস্ট মাসে আমার এক ভাগ্নের শ্বশুরকে পাঠালাম। কিছু খেয়ে হজম হতনা ভদ্রলোকের। জল খেয়ে জল হজম হয়না, না খেয়ে খেয়ে চড়াই পাখি। যেদিন ওখান থেকে ঘুরে এলেন, তার পরদিন থেকে বাজারের চপ কাটলেট মাংস পরোটা—খাচ্ছেন। এখন ইয়া শরীর।

—আরে বাবা, সবই তো বলছ, কিন্তু ফুলপুরটা কোথায় সেটা তো বলছ না।

—ইস। কী বলছেন মেসোমশাই। বলব না তো যেচে আপনার কাছে এলাম কেন? মনটা পরোপকারী বলেই তো? আমার এক প্রতিবেশী, হঠাৎ একদিন বলা নেই কওয়া নেই পাগল হয়ে গেল—

—পাগল হয়ে গেল? না বলে কয়ে?

—তবে আর বলছি কি? রাত্রে বেশ খেয়েদেয়ে শুয়েছে, সকালবেলা উঠে ধেই ধেই নাচ।

—অ্যাঁ।

—সেইতো, শুনুন না—ডাক্তার কবরেজ হোমিও হেকিমি, মাদুলি কবচ কিছু বাকি রাখল না, নাচন আর থামেনা। আমি তো মেসোমশাই সমানে ফুলপুরের কথা বলে চলেছি, সেটা আর তারা কানে নেয়না। শেষমেষ একদিন তার দাদা এসে বলল, ফুলপুরটা কোথায় ভাই ?

নিত্যগোপাল তাড়াতাড়ি বলেন, "আমিও তো তাই জিগ্যেস করছি বাবা, ফুলপুরটা—

—আঃ মেসোমশাই কাহিনীর শেষটা শুনুন ? বলল এসে। আমিও বলে দিলাম—

নিত্যগোপাল আরো তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "কী বলে দিলে ?"

—বলে দিলাম, এখন কেন ? প্রথমে যখন বলেছিলাম তখন তো—তারপর অনুনয় বিনয় করাতে দিলাম বুঝিয়ে, ব্যস। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এলো মানুষ একেবারে সহজ সুস্থ। দেড়মাস ধরে যে নেচেছে মনেও নেই। বলল কি—

—বুঝতে পেরেছি কী বলল। কিন্তু তুমি বাবা একটু তাড়াতাড়ি বলে দাও ফুলপুরটা কোথায়। আমার আবার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রোদ পড়লেই তো হিম পড়বে।

—ঠাণ্ডা লাগার কথা বলছেন ?

পরোপকারী লোকটি একটু উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে ওঠে, "ইচ্ছে করলে আপনি আজই রাত্রে শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ফুলফোর্সে পাখা খুলে শুতে পারেন।"

—তার মানে ?

নিত্যগোপাল গ্লাভস্‌পরা হাতে লোকটার কাঁধটা যতটা সম্ভব জোরে চেপে ধরেন।

—মানে আর কি ? এখনই চলে যান না ফকির গাজীর আস্তানায়। চিকিৎসা তো এক মিনিটের।

নিত্যগোপাল প্রায় চেঁচিয়ে ওঠেন, "চলে যান মানে? চলে অমনি গেলেই হলো? আমি জানি সেই ফুল ফকিরের আস্তানাটা কোথায়?"

—ফুল ফকির! আঃ, মেসোমশাই? এইটুকু মুখস্থ করতে পারছেন না? ফুলপুরের ফকির গাজী, বুঝলেন? এই নামেই বিখ্যাত তিনি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছি মুখস্থ—ফুলপুরের ফকির গাজী। এইতো? এখন বল সেই ফুলপুরটা কোন লাইনে? কতদূরে—

—কতদূরে?

লোকটা অবহেলায় বলে, "দূর আবার কোথা? এইতো—হাওড়া থেকে বড়জোর মাইল আষ্টেক।"

"অ্যাঁ······অ্যাঁ অ্যাঁ।"

উপায় থাকলে স্প্রাঙের মত ছিটকে উঠতেন নিত্যগোপাল, উপায় নেই বলেই বালির বস্তার মত একবার উঠেই, আবার ধপাস করে বসে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন, "এই নাকের কাছে বিশল্যকরণী আর আমি সারাজীবন নাকের জলে ভাসছি। কালই চলে যাব। অত কাছে যখন, গাড়িতেও তো যাওয়া যায়। যায় না?"

—গাড়িতে যাওয়া যায় না?

নিত্যগোপালের নতুন পাওয়া শালী-পো একটু করুণার হাসি হেসে বলে, "যাওয়া যায় না তো যতসব রাজা-মহারাজা জজ ম্যাজিস্ট্রেট, কোটিপতি বিজনেসম্যান, তাবড় তাবড় সিনেমা স্টারেরা যাচ্ছেন কিসে? লোকাল ট্রেনে ঘস্‌টাতে ঘস্‌টাতে? গেলে বুঝবেন কারা সব আসে। কী সব মারকাটারি গাড়ির লাইন।

—ওঃ। আমার আর দেরী সইছেনা বাবা। তুমি তাড়াতাড়ি রাস্তার ডিরেকশানটা দিয়ে দাও। মারকাটারি না হোক, গাড়ি একটা আছে আমার। জামাইয়েরও একটা—

—তাতো থাকতেই পারে মেসোমশাই। গাড়ি একখানা আজকালকার

দিনে কার না থাকে? তবে কথা হচ্ছে, প্রথম দিন ট্রেনে যাওয়াই ভাল। রাস্তা গোলমাল হবার ভয় থাকবে না।

নিত্যগোপাল সন্দেহের গলায় বলেন, "প্রথমদিন মানে তুমি তো বললে একদিনেই—"

—আহা হা, তাতো বলেইছি। একদিন কেন, একমিনিটের তো ব্যাপার। কিন্তু সেরে যাওয়ার আহ্লাদে পূজো দিতে আসে না লোকে? কী গাদা গাদা পূজো পড়ে। মানুষ তো আর অকৃতজ্ঞ নয়!

নিত্যগোপাল অপ্রতিভ গলায় বলেন, "বুঝেছি। তাহলে প্রথম দিন ট্রেনেই যাব। কাল সকালেই মানে রোদ ওঠার পর ফার্স্ট যে ট্রেন পাবো। তুমি তাহলে তাড়াতাড়ি বলে দাও সেই ফুলপুরটা কোন লাইনে, কোন বরাবর—"

—বলে তো আমি দিচ্ছি, তবে টিকিট কাটতে আর কাউকে পাঠাবেন মেসোমশাই। হাওড়া স্টেশনে ল্যোকাল ট্রেনের টিকিটে যা লাইন—

—আরে বাবা, ও নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না। ঢের লোক আছে আমার, তুমি শুধু ফুলপুরের হদিসটা—

—হদিস আবার কী? জলের মত সোজা—ইয়ে কটা বাজল একটু দেখুন তো মেসোমশাই—একটু তাড়া আছে।

তাড়া থাকলেই বাঁচেন নিত্যগোপাল। তাড়াতাড়ি ঠিকানাটা বলে চলে যায়, আর কথা বাড়ায় না। তাই কোটের বুক পকেট থেকে ঘড়িটা বার করেন। দস্তানাপরা হাতে ঘড়ি বাঁধা তো অসুবিধে।

বার করে দেখে বলেন, "তিনটে বাইশ--"

—অ্যাঁ! ডকুমেণ্টারিগুলো হয়েই গেল—

ওর তো আর স্প্রীঙের মত ছিট্‌কে ওঠায় অসুবিধে নেই। তাই ছিট্‌কেই ওঠে, আর উঠেই ছুটতে থাকে—"সিনেমার টিকিট কাটা ছিলো।"

নিরুপায় নিত্যগোপালও তাঁর গামবুট-পরা পায়ে তার পিছু পিছু ছুটতে থাকেন, "ফুলপুরের ইয়েটা বলে গেলে না? কোন লাইন?"

নীল র‍্যাপার ছুটতে ছুটতে বলে, "আসল বই আরম্ভ হয়ে গেল বো-ধা-য়।" বলতে বলতে ছোটে।

নিত্যগোপালও ছোটেন, নীল র‍্যাপারের ছায়া লক্ষ্য করে—আচ্ছা "লোঃ-লোঃ-লোক তোঃ! আসল কঃ-কঃ-কথাটা বলে যাবে তোঃ।"

কিন্তু একটা বস্তা বয়ে নিয়ে কত ছুটতে পারে একজন ষাট বছরের ভদ্রলোক? ক্রমেই পিছিয়ে পড়েন। নীল র‍্যাপার চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়, চোখের সামনে একটা কালো চাদর। নিকষ কালো। কোন লক্ষ্যে ছুটবেন তবে? তবু চেঁচাতে চেঁচাতে ছোটেন, "ফু-ল-পু-র-টা কো-থা-য়—" হঠাৎ একটা ভারী জিনিস জলে পড়ে যাওয়ার ঝপাৎ শব্দ পেলেন নিত্যগোপাল।

কিসের শব্দ? কী পড়ল জলে?

কালো চাদরটা যেন ক্রমেই পৃথিবী ঢেকে দিচ্ছে।

সেই অন্ধকারের মধ্যে অনেক কলকোলাহল শুনতে পেলেন। অনেকের গলার শব্দ……কারা যেন সব চেঁচাচ্ছে……"মোষ—মোষ……একটা মোষ ক্ষেপে ছুটে আসছিলো—মারা যাবে……মারা যাবে……আহা কেষ্টর জীব…… সুইমিং ক্লাবের ছেলেদের ডাকো, যদি বোটে করে তুলতে পারে……"

ওঃ! তখন ওই মোষটা পড়ার শব্দ হয়েছিল!

নিত্যগোপাল আচ্ছন্নের মধ্যে ভাবলেন, কিন্তু আমি কোথায়? আমার চারদিকেও তো জল। নাকের কাছে জলের গন্ধ পাচ্ছি।……তারমানে আমিও পড়ে গেছি।

ভারী দুঃখ হল নিত্যগোপালের।

একটা মোষের জন্যে এতো হৈ চৈ করছে সবাই আর তিনি শ্রীনিত্যগোপাল বোস রিটায়ার্ড সাব্‌জজ, তাঁর জন্যে কারো মায়া-দয়া নেই!

দুঃখে রাগে চোখে আরো অন্ধকার দেখলেন নিত্যগোপাল, তারপর আর

কিছুই দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন না, শুনতে পেলেন না, বুঝতে পারলেন না।

জানতে পারলেন না, তিনি কোথায় আছেন, কেন আছেন, আদৌ আছেন কি না।

কত সময় গেল কে জানে।……কখন কী সূত্রে চোখের সামনে থেকে সেই কালো চাদর সরে গেল কে জানে, হঠাৎ একসময়, চোখ খুলে দেখতে পেলেন নিত্যগোপাল, তিনি নিজের ঘরে শুয়ে আছেন, আর খাটের চারধারে অনেক লোকজন। চেনা, অচেনা অনেক মুখ।

কে এরা?

নিত্যগোপাল কি তাহলে মারা গেলেন? এরা সবাই তাঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে? তাই হবে। আমি নিশ্চয় বেঁচে নেই। না হলে আমার শরীরটা এতো হালকা লাগছে কেন? মাথা থেকে পা অবধি কোথাও কোনো ভার নেই। ঠিক, ঠিক! মৃত্যুর পরে শুনেছি আত্মাটা হালকা হয়ে, দেহ ছেড়ে উঠে পড়ে। বিছানায় যাকে শুয়ে থাকতে দেখছি সেটা তাহলে আমার ছাড়া দেহ!

ইস! এই দেহটাকে এক্ষুণি সবাই মিলে খাটে চাপিয়ে নিয়ে গিয়ে—

ওঃ! আর ভাবতে পারেন না নিত্যগোপাল।

নিজের শোকে নিজের চোখে জল আসে তাঁর।……

কিন্তু কখন মরলাম?

কেনই বা মরলাম?

কিছু মনে পড়ছে না কেন?

কিন্তু, কিন্তু……সত্যিই কি মরেছি?

কিন্তু সবই তো বুঝতে পাচ্ছেন, টের পাচ্ছেন।

এইতো বিচ্ছু গুটি গুটি এসে তাঁর বোজা চোখের পাতা টেনে টেনে

বলছে, "ও দাদু। তুমি আবার মরে যাচ্ছো কেন, এক্ষুনি তো একবার বাঁচলে।"

ঘরে অনেক গলার হো হো হাসি শুনতে পেলেন নিত্যগোপাল।

কারা অমন হেসে উঠল?

চোখ তাকালেন।

গোটা চার পাঁচ ছেলে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাসছে। কী পরে রয়েছে ওরা? সাঁতার কাটবার জামা? এই ঠাণ্ডায়! মরতে চায় নাকি?

ওদের কি আচ্ছা করে বকে দেওয়া উচিত নয়?

বকতে গেলেন, চেঁচাতে পারলেন না।

এগিয়ে এলো বড় ছেলে, বলল, "বাবা, এরা হচ্ছে সুইমিং ক্লাবের ছেলে। এরাই আজ তোমায় বাঁচিয়েছে। ভাগ্যিস তখন ছিল সবাই।"

ছেলেগুলো হৈ হৈ করে বলে ওঠে, "আরে তখন কি জানি দাদু জলে পড়েছেন আপনি?......সবাই চেঁচাচ্ছে মোষ! মোষ! বোটে তুলতে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড।......তা লোকের দোষ নেই দাদু, অ্যাইসা মাল গায়ে চাপিয়ে জলে পড়েছিলেন। ভিজে একেবারে ষোল মণ। হাতী বললেও মানিয়ে যেত। টেনে তুলতে—ও!"

আবার হাসি, "দাদুর মাথা থেকে পা অবধি খোশা ছাড়াতেই তো ঘণ্টা খানেক লেগেছে। একটা করে খুলি, তার নীচে আর একটা, সেটা খুলি আর একটা।......এরপর আপনি আমাদের ক্লাবের মেম্বার হয়ে পড়ুন দাদু। আপনার যখন এরকম হঠাৎ জলে পড়ার অভ্যাস।......সাঁতার জেনে রাখা ভাল।"

আবার হাসি।—এতো হাসতেও পারে ছেলেগুলো।

হাসি জিনিসটা না কি স্বাস্থ্যের লক্ষণ। তা ওদের দেখলে বিশ্বাস হচ্ছে। বললেন, "এদের সব ভাল করে মিষ্টি খাইয়ে দাও বৌমা। তোমাদের মস্ত উপকার করেছে।"

ছেলেরা বলে উঠল, "শুধু মিষ্টি মানে? আজ তো আমাদের এখানে ডিনারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মুরগী, ফ্রায়েড রাইস, গলদা চিংড়ির কারি—বাড়ি থেকে ভদ্রলোক হয়ে আসি।"

চলে গেল হাসতে হাসতে।

ওরা চলে গেলে নিত্যগোপাল বললেন, "আমার জামা জুতো ছাড়াতে এক ঘণ্টা লেগেছিল?"

—বেশী তো কম নয় বাবা।

—ওই অতক্ষণ ভিজে জামার ভার?

—জামা কি? বস্তা বলুন। ভিজে তো জামারা বস্তা হয়ে গেছে।

—সেই জল বুকে বসেছে?

—তা তো বসেইছে।

—তবু আমি বেঁচে রয়েছি?

—রয়েছেন না?

—এটা আমার মৃতদেহ নয়?

এখন বাড়ির লোকেরাই হেসে ওঠে।

নিত্যগোপাল বলে ওঠেন, "আমার গায়ে শুধু একটা গেঞ্জি? একখানা লেপ?"

—ডাক্তার বলে গেছে এইভাবে রাখতে।

নিত্যগোপাল রেগে আগুন হয়ে বলেন, "তাতো বলবেই। আমার নিউমোনিয়া হলে তো তারই লাভ। শীগগির আমায় গরম জামা এনে দে।"

—সে সব তো ছাদে পড়ে আছে, কাল সকালে রোদ উঠলে শুকোবে।

—আর গরম জামা নেই আমার?

—থাকবে না কেন? ডাক্তার বলেছে, ওগুলো শুকোলে তবে পরতে। তা সাতটা দিন তো অপেক্ষা করতেই হবে। তার আগে শুকোবে না।

তাই করতে হল।

সাতদিন বিনা গরম জামায় কাটালেন নিত্যগোপাল। বলতে কি, ছেলে বৌ মেয়ে জামাই আর ডাক্তারের ওপর রাগ করেই এই ভয়ানক অবস্থার মধ্যে রইলেন।

—ঠিক আছে। তোমাদের কথাই থাক। বুঝবে ঠ্যালা, যখন বাড়ির কর্তার ডবল নিউমোনিয়া হবে।

কিন্তু কী আশ্চর্য। কিছু হয় না। জামা শুকোবার পর তাদের আর পরতেই ইচ্ছে হয় না নিত্যগোপালের।

কারণ অবাক হয়ে দেখেন তিনি, নিত্যগোপাল, আছেন অথচ তারা নেই। যারা তাঁর চিরসঙ্গী ছিল।······সেই—সর্দি কাসি, গলায় ব্যথা, মাথা ভার, নাকের জল, চোখের জল।······না, কেউ নেই। কাজেই আতঙ্কও নেই।

কী হালকা! কী নতুন!

তারপর?

তারপর নিত্যগোপাল আদ্দির পাঞ্জাবী পরছেন, সন্ধ্যের-হাওয়া গায়ে লাগিয়ে লেক-এ বেড়াতে যাচ্ছেন, সেখানে ঠেলাগাড়ির আইসক্রীম, আর মাথায়-হাঁড়িওলার কুলপি বরফ খাচ্ছেন।

আর সুইমিং ক্লাবে ভর্তি হবার জন্যে 'কস্টিউম' কিনতে দিয়েছেন।

ডাক্তার বলছে বিষে বিষক্ষয়।

জলে ডুবে আর একঘণ্টা ভিজে পোষাকে থেকে, চিরকালের ঠাণ্ডালাগার ধাত বিলকুল সেরে গেছে। নিত্যগোপালের কিন্তু ধারণা অন্য।

তাঁর মনে হয় এ সেই 'গাজীপুরের ফুল ফকির' না 'ফকিরপুরের গাজী ফুল।' নাকি 'ফুল গাজীরপুর ফকিরের' টোটকার এফেক্ট।

কলকাতা থেকে তো মাইল আষ্টেক দূরে। কে বলতে পারে ঠিক সেই সময় তিনি কারো জন্যে মন্ত্রপূত শিকড় পোড়াচ্ছিলেন কিনা, আর বাতাসে ভেসে সেই ধোঁয়া নিত্যগোপালের নাকের মধ্যে এসে ঢুকে পড়েছিল কি না। বাতাস ঘণ্টায় ক'মাইল ছোটে? মানে ছুটতে পারে?

নিত্যগোপালের অবশ্য কখনো পূজোটুজো দেওয়া মাথায় আসেনা, কিন্তু এখন ওইটা মাথায় ঘুরছে।

একটু পূজো দেওয়া উচিত।

মানুষ তো অকৃতজ্ঞ নয়।

কিন্তু দেবেন কী করে ?

ঠিকানা ?

পরে রাস্তায়, লেক-এ সর্বদা নিত্যগোপাল সেই নীল র‍্যাপারখানি খুঁজে বেড়ান।

শীত পালালে যে চাদর র‍্যাপাররা বাক্সবন্দী হয়ে যায়, সেটা খেয়াল হয়না নিত্যগোপালের।······তাঁর চোখের সামনে অবিরত একখানি ছুটন্ত নীল র‍্যাপারের কোণ দুলতে থাকে। একবার দেখতে পেলেই ছুটে গিয়ে সেই কোণ চেপে ধরবেন। হ্যাঁ ছুটে গিয়েই, এখন তো আর ছোটার অসুবিধে নেই ? গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পরনে মলমলের পায়জামা, পায়ে হালকা চটি। ছুটে যাবেন, চেপে ধরবেন।

চেপে ধরে কী বলে উঠবেন ?

"চল বাছাধন এইবার তোমায় পুলিশে দিই।"

না, না, তা বলবে না নিত্যগোপাল বোস। তাঁর একটা কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ? বলে উঠবেন, "কী হে মাণিক, সময় দেখার ছলে ঘড়িটি নিয়ে ছুট মারলে বেশ করলে, তার সঙ্গে বুক পকেট থেকে মানিব্যাগটিও হাতালে, তাতেও কিছু বলছিনা, ঘড়ি আংটি কলম মানিব্যাগ এরা তো হারাবার জন্যেই জন্মায়, আর হারালে কখনোই আদায় হয়না, এ সবই জানি। কিন্তু ছুট দেবার আগে ঠিকানাটা বলে গেলে কী হতো ? অ্যাঁ ? বলে গেলে কী হতো ? মানুষের একটা কৃতজ্ঞতা নেই ? ছুটতে ছুটতেও বলে যেতে পারতে না তোমার সেই গাজীফুলের ফকির······নাকি ফকিরফুলের গাজী······নাকি ফুলগাজীর ফকিরটি কোন লাইনে! অ্যাঁ ? বলে যেতে পারতেনা চাঁদ ? একটা কৃতজ্ঞতা নেই ?"

প্রকাশন বিভাগ
তথ্য ও বেতার মন্ত্রক
ভারত সরকার

